সেরা খেলাধুলা

ফুটবল রঙ্গ

মাসুদ মাহমুদ

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৯
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১০০০
FOOTBALLRANGA
By : Masud Mahmud

প্রিয় পাঠক

ফুটবলরঙ্গের কি অন্ত আছে! কতো ঘটনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক-সেদিকে! কতো ঘটনা ঘটছে হয়তো আপনারই চোখের সামনে!

কোনো বই বা পত্রিকা থেকে যোগাড় করা হোক, কিংবা আপনার নিজের চোখে দেখা হোক, আপনি সেসব লিখে পাঠিয়ে দিন সেবা প্রকাশনীর ঠিকানায়। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপরে অবশ্যই উল্লেখ করবেন 'ফুটবলরঙ্গ-২'। আপনার লেখাটি মনোনীত হলে ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য 'ফুটবলরঙ্গ' দ্বিতীয় পর্বে তা ছাপা হবে এবং ছাপা হবে আপনার নাম। আপনার সহযোগিতার ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে 'ফুটবলরঙ্গ' দ্বিতীয় পর্বের প্রকাশনা।

আপনার আনন্দ-বিনোদনের অংশীদার করুন সেবা প্রকাশনীর পাঠকদের।

—প্রকাশক।

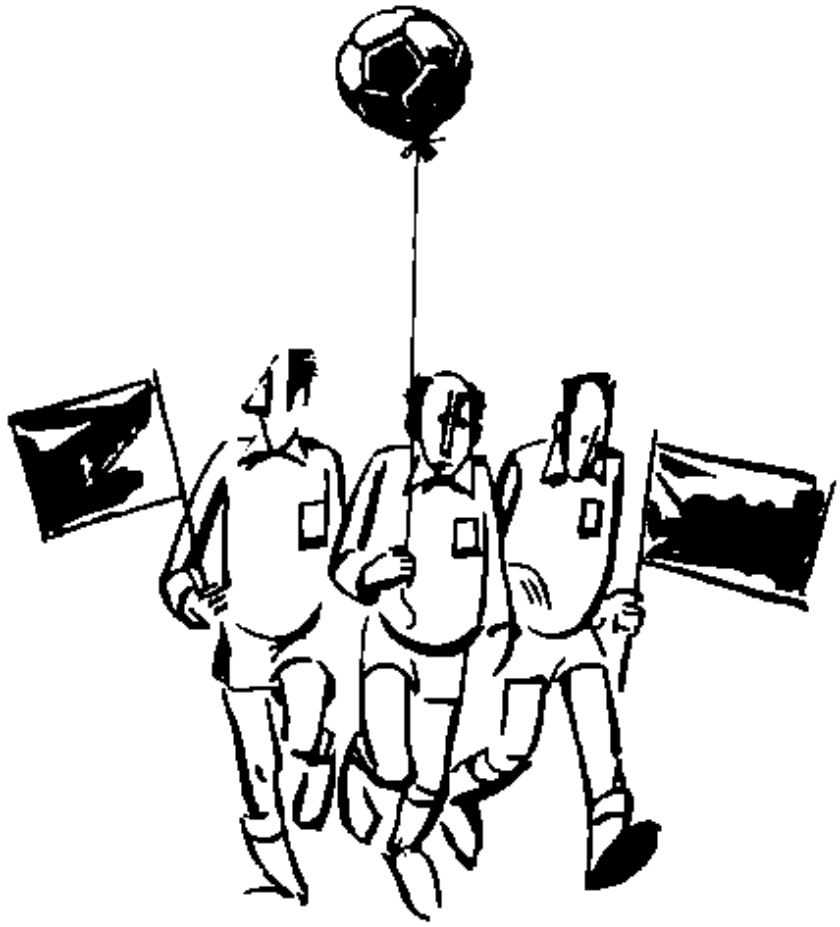

ভূমিকা

বইটি আমার মৌলিক রচনা নয়—শুরুতেই সেটা বলে রাখা দরকার। বিদেশী পত্র-পত্রিকা এবং বই ঘেঁটে উদ্ধার করেছি সবকিছু। বইয়ে ব্যবহৃত প্রতিটি কার্টুনও বিদেশী। তাই সংগ্রহটুকুই আমার কৃতিত্ব, এর বেশি কিছু নয়।

মাসুদ মাহমুদ
ঢাকা।

সূচীপত্র

ফুটবল ফুটবল ... ৭

ইতিহাসের ইতিহাস ১২

অচেনা ফুটবল : ফুটবল ইতিহাসের চমকপ্রদ দিক ... ১৫

ফুটবলে কনিষ্ঠ খেলোয়াড়শ্রেষ্ঠ ... ২৩

ফুটবলে কৌশলের ক্রমরূপান্তর ২৭

ফুটবলের অবাক সন্দেশ ৩৪

ফুটবলরঙ্গ ৪৮

[পৃথিবীতে তিন রকমের মানুষ আছে। এক দল—ফুটবল-প্রেমিক, আরেক দল—ফুটবল-উদাসীন এবং তৃতীয় দল—ফুটবল বিদ্বেষী।

ফুটবল বিষয়ে প্রতিটি লোকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বই থেকে পৃথিবী-বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির মতামত পাওয়া গেছে ফুটবল সম্পর্কে। কেবল সৈয়দ শামসুল হক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং হামিদা পারভীনের মতামত সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত।]

☐ ফুটবল আসলে অনেকগুলি খেলার সংমিশ্রণ, যেমন—দৌড়, ঝাঁপ, নিক্ষেপ।...পরিবেশ এবং অবস্থা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কর্তব্যবোধের শিক্ষা দেয় ফুটবল। কর্তব্যটি হতে পারে একক কিংবা দলগত। ফুটবল সতীর্থের ভুল শোধরানো শেখায়। যে-খেলাটি এতোগুলো

মহৎ গুণ শিক্ষা দেয়, সেটাকে সব খেলার শ্রেষ্ঠ খেলা স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় আছে ?

পিয়ের দ্য কুবের্তে
আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক।

❑ আমি প্রায়ই ভাবি : ফুটবলের প্রতি আমার যে-ভালোবাসা, সেটার কোনো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে কী ? নাহলে এতোটা অমোঘ আকর্ষণের কারণ কী ? ফুটবলের প্রতি আমাদের ভালো-বাসা আসলে প্লেটোনিক, যা থেকে আমাদের লাভের পরিমাণ অতিশয় কিঞ্চিৎ। তাই, ফুটবলের সবকিছু বোঝা সম্ভব এবং সব রহস্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব—এমনটি ভাবা উচিত নয়। ফুটবলের অনেক কিছুই ব্যাখ্যাতীত, ঠিক তার প্রতি আমাদের ভালোবাসার মতোই।

ইউরি ত্রিফোনভ
সোভিয়েত লেখক।

❑ এতো প্রচণ্ড প্রকাশধর্মিতা ফুটবল কোথেকে পেলো ? মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সে কোন শক্তিতে ?

বুঝতে পারি না, রহস্যটা কোথায়। দৃশ্যটা তো অসাধারণ কিছু নয়—২০ জন মিলে একটা বল দুমদাম পাঠিয়ে দিচ্ছে এদিক-সে-দিক। অথচ এই ঘটনাটাই প্রভাব ফেলছে হাজার হাজার লোকের ওপরে।...একজন চিত্রপরিচালক যদি শিখতে পারতো রহস্যটা !

সের্গেই আইজেনস্টাইন
সোভিয়েত চিত্রপরিচালক।

ফুটবল হলো নিঃশব্দ সংকেতমালার সম্মিলন বিশেষ, যেগুলো সচরাচর থাকে চিত্রকলায় এবং চলচ্চিত্রে। প্রতিটি ফুটবলারের আলাদা ক্রিয়া-কলাপ এবং আচরণকে তুলনা করা যেতে পারে ভাষাবিদ্যার প্রাথমিক এককগুলোর সাথে। আর সব ফুটবলারের কার্যকলাপের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় একটি 'ভাষা', যে-ভাষায় কথা বলে ফুটবল।

পিয়ের-পাওলো পাজোলিনি
ইতালিয় চিত্রপরিচালক এবং লেখক।

□ খেলোয়াড়দের ফুটবলার-জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। তাই কোনোকিছুর 'রাফ কপি' করার সময় নেই; যা করবার, একবারে 'ফ্রেশ কপি' করতে পারলে সবচে' ভালো। আমি সবসময় তা-ই করে এসেছি, এখনও সেটার চেষ্টাই করে যাচ্ছি। বলা যায়, জীবনের সবকিছু আমাকে শিখিয়েছে ফুটবল। এর চেয়ে ভালো কোনো খেলার কথা আমার জানা নেই।

লেভ ইয়াশিন
সোভিয়েত গোলরক্ষক।

□ আমি মনে করি, ফুটবল হবে আনন্দদায়ক নাটকের মতো, আর সমর্থকেরা—দর্শক।

সত্যিকারের ফুটবল, আমার মতে, শুরু হয় তখন, যখন খেলায় গোলের সম্ভাবনার মুহূর্ত উপস্থিত হয়। খেলার সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করে এই মুহূর্তগুলো, যখন অসহনীয় মানসিক উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ আপ্লুত করে দর্শকদের। খেলায় যখন গোলের সম্ভাবনার মুহূর্ত

অনুপস্থিত, তখন ফুটবল পর্যবসিত হয় সারা মাঠ জুড়ে খেলোয়াড়দের অনর্থক দৌড়াদৌড়িতে।

মিশেল প্লাটিনি
১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, সালে
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার।

□ ফুটবল খেলার প্রতি আমার আকর্ষণটা খুবই সশ্রদ্ধ এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। পৃথিবীর সব খেলাই ভাল, এবং সবেতেই মজা আছে। কিন্তু কেন জানি না ফুটবল খেলাটাকে আমার কেমন যেন 'ম্যাজিক ম্যাজিক' বলে মনে হয়। না, আমি কোনও 'ছু-মন্তোর'-এর কথা বলছি না, বলছি ফুটবল খেলার সবকিছুকে ঘিরে যে একটা ম্যাজিকের মতো পরিবেশ আছে তার কথা। ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে যখন খেতে বসতাম, মনে আছে, তখন পাড়ার বন্ধুদের বল নিয়ে প্র্যাকটিস করার আওয়াজ ভেসে আসত।...সেই আওয়াজের জাদুতে আমার চা-জলখাবার খাওয়ার স্পিড বেড়ে যেত। নাকে মুখে কোনও মতে কিছু গুঁজে মনের অজান্তে কখন যেন দৌড় দিতাম তা আমাকেও অবাক করে দিত। কত খেলা আছে —কিন্তু ফুটবলের আওয়াজের মতো অত স্পিডে খাবার ভ্যানিশ করাবার ক্ষমতা বোধহয় আর কোনও খেলায় নেই।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)
জাদুকর।

□ আমি জীবনে কোনোদিন কোনো খেলা খেলিনি। তবে একটি বল

নিয়ে বাইশজন লোক কেন দাপাদাপি করে, আমি সেটা বুঝতে পারি না।

সৈয়দ শামসুল হক
কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং ছোটগল্পকার।

☐ আমি বলের তিন নম্বরের বেশি উঠতে পারিনি, পাঁচ নম্বর সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। এই খেলায় খেলোয়াড়রা হারে কিম্বা জেতে আর দর্শকরা মারামারি করে। কেউ কেউ বলে, নতুন নতুন দারুণ দারুণ গালাগালি যদি শিখতে চাও, তা হলে ফুটবল খেলার মাঠে যাও!

তবে, টেলিভিশনে মারাদোনা কিংবা প্লাতিনির খেলা দেখতে গেলে চোখ আটকে যায়। তখন মনে হয়, মানুষের পায়েও প্রতিভা থাকতে পারে!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, সাহিত্যিক।

☐ ফুটবল আমার দু'চোখের বিষ। কী যে মজা ওতে পায় লোকে, সেটা আমার মাথায় আসে না। সবাই ফুটবল দেখে, তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ফুটবল দেখবে, চিৎকার করে গলা ফাটাবে, ঝগড়া করবে উত্তেজিত হয়ে (কোনো স্বার্থ ছাড়া অমন করে ঝগড়া করা সম্ভব কীভাবে, ভেবে পাই না), হাতাহাতি করবে —এ কী রে, বাবা!

আমার কর্তা মাঝে-মধ্যে ফুটবল নিয়ে এতো মত্ত থাকেন যে, ফুটবলকে আমার সতীন মনে হয় প্রায়ই।

হামিদা পারভীন
একজন গৃহিণী।

ইতিহাসের ইতিহাস

ইংল্যাণ্ডকে ফুটবলের জন্মভূমি বলা হলেও কথাটা, সম্ভবত, সঠিক নয়।

কারণ, কয়েক হাজার বছর আগে চীন এবং জাপানে বল নিয়ে এক ধরনের দলীয় খেলার প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়। সেই সময় বিজয়ী দলকে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হতো ফুল কিংবা ফুলদানী। বিজিত দলের জন্যে প্রাপ্য থাকতো বেত্রাঘাত।

ফারাওদের সময় প্রাচীন মিসর এবং পারস্যে বল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি খেলা প্রচলিত ছিলো। প্রাচীন গ্রীসেও ফুটবল-সদৃশ একটি খেলা জনপ্রিয় ছিলো ভীষণ। খেলার সময় মাঠে খেলোয়াড়রা ছাড়াও উপস্থিত থাকতো একজন আম্পায়ার। খেলাটির

নাম ছিলো 'এপিসকিরোস'।

প্রাচীন রোমানরা যখন গ্রীস দখল করলো, সাথে সাথে তারা সাদরে গ্রহণ করলো প্রকৌশল, শিল্প-সংস্কৃতি এবং খেলাধুলোয় গ্রীসের বিভিন্ন সাফল্য ও অগ্রগতিকে। ফুটবল-সদৃশ খেলাটিও বিপুল প্রসার লাভ করলো রোমান সাম্রাজ্যে। তারা খেলাটির নাম দিয়েছিলো 'হারপাস্তুম'।

বলা বাহুল্য, রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো ইউরোপের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে এবং ইংল্যাণ্ড পুরোপুরি ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের দখলে।

□ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানদের দৌলতে ইংল্যাণ্ডে আমদানী হলো 'হারপাস্তুম' খেলার। স্থানীয় লোকজন খুব দ্রুত শিখে ফেললো খেলাটি। ভীষণ জনপ্রিয় তা বৃটেনের কৃষকদের ভেতরে। খেলাটি তখনই চমৎকার এই ইংরেজি নামটি পেলো—'ফুটবল'।

□ ফুটবল তখন ছিলো ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক খেলা। সে-কারণেই সম্রাট দ্বিতীয় এডওয়ার্ডসহ অনেক শাসকই ফুটবলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

শেক্সপিয়ারের একটি নাটকে 'ফুটবলার' শব্দটি আছে। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন খিস্তি হিসেবে।

□ ইংল্যাণ্ডে ফুটবলের জনপ্রিয়তা এতোই প্রবল ছিলো যে, খেলা চলতো রাস্তায়, মাঠে-ময়দানে, বাজারে—যদিও খেলার নিয়ম-

কানুন একেবারেই প্রায় ছিলো না তখনও।

তখনকার শাসকগোষ্ঠী ফুটবলকে একটি সামাজিক বিনোদন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলো না। বরং ফুটবলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে দলিলটি ছিলো, তাতে ফুটবল খেলার অপরাধে গ্রেফতার করার নির্দেশনামা ছিলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপরে।

□ হাজার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অব্যাহত রইলো ফুটবলের অগ্রযাত্রা। সুনির্দিষ্ট একটি চরিত্র ধারণ করতে ফুটবলের কেটে গেল বেশ কয়েক শতাব্দী।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলোয় জেঁকে বসলো ফুটবল। চল্লিশের দশকের দিকে প্রতিষ্ঠিত হলো কয়েকটি ফুটবল ক্লাব।

□ বস্তুত ফুটবলের জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড না হলেও তাকে ফুটবলের প্রতিপালক বলা চলে। ফুটবলের আধুনিকায়ন, জনপ্রিয়তা, প্রসার —সবকিছুর পেছনে ইংল্যাণ্ডের অবদান অপরিসীম, এ-কথা অনস্বীকার্য।

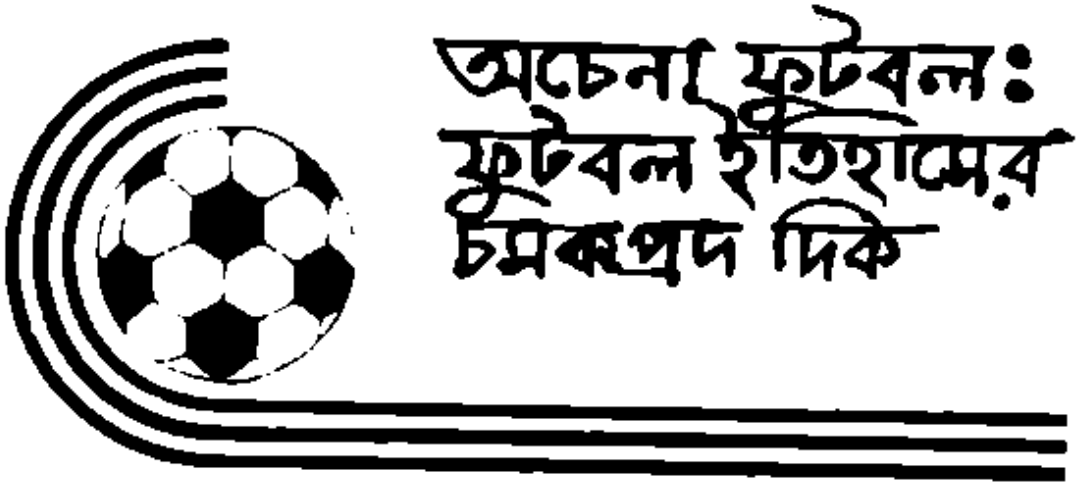

অচেনা ফুটবল: ফুটবল ইতিহাসের চমকপ্রদ দিক

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি আধুনিক ফুটবলের নিয়ম রচনা করেন ১৮৪৮ সালে। পৃথিবীর প্রথম ফুটবল ক্লাবের নাম 'শেফিল্ড এফ কে'। ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ড শহরে ১৮৫৭ সালের ২০শে অক্টোবর স্থাপিত হয়েছিলো ক্লাবটি। এই বছরেই আধুনিক ফুটবলের প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮৬২ সালে 'নট্‌স্ কাউন্টি' নামে যে-দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দলটি টিকে আছে আজ পর্যন্ত। ফুটবলের নিয়ম-কানুনে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয় এই বছরেই, যেমন—'বল গোল লাইন পার হয়ে গেলেই গোল হয়েছে বলে ধরা হবে, যদি বলটি হাতের সাহায্যে না মারা হয়।'

ফুটবলের ওপরে রচিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম বই প্রকাশিত হয় লণ্ডনে ১৮৬৩ সালে। বইটির রচয়িতা ছিলেন ডি. ব্লিংগ।

☐ ১৮৬৫ সালের আগে পর্যন্ত গোলপোস্টে কোনো ক্রসবার থাকতো না। দুই সাইড বারের মাঝখান দিয়ে বল পাঠাতে পারলেই গোল হতো, তা যতো উঁচু দিয়েই যাক! সেই বছরই ৮ ফুট উঁচু দুই গোলপোস্টের মাথায় ক্রসবার হিসেবে ফিতে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফ্রী কিকের প্রচলনও এ-বছরেই।

☐ অফসাইড নিয়মের প্রচলন হয় ১৮৬৬ সালে এবং ফেয়ার ক্যাচ বা হাত দিয়ে বল ধরার নিয়ম বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর আগে পর্যন্ত খেলা চলাকালীন যে-কোনো খেলোয়াড় হাত দিয়ে বল থামাতে পারতো।

☐ ১৮৭১ সালে নিয়ম করা হয়—'গোলরক্ষকই একমাত্র খেলোয়াড়, যে হাত দিয়ে বল স্পর্শ করার অধিকার রাখে।' আইনটির ভেতরে যে বিশাল ফাঁক ছিলো, সেটাকে ব্যবহার করতে পিছপা হতো না তখনকার গোলরক্ষকেরা—বল হাতে ধরে তারা চলে যেতো মাঠের যেখানে-সেখানে।

☐ ১৮৭১ সালের আগে পর্যন্ত খেলার বাঁধা-ধরা কোনো সময়সীমা ছিলো না। প্রতিপক্ষ দলদুটো খেলা শুরু হবার আগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতো খেলার সময় কিংবা কতো

গোল হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে, সেই বিষয়টি। খেলায় ক'বার বিরতি হবে, সেটাও স্থির করা হতো আগেই।

বিরতিগুলো তখন হতো অতিশয় দীর্ঘ। খেলোয়াড়েরা গোসল করতো, কাপড় বদলাতো, বিশ্রাম নিতো। পরে খেলার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় দেড় ঘণ্টা। খেলায় একটি মাত্র বিরতির আইন চালু হয় ১৮৮৩ সালে।

] প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগো শহরে ১৮৭২ সালের ৩০শে নভেম্বর। স্থানীয় একটি ক্রিকেট ক্লাবের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই খেলায় অংশ নিয়েছিলো ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড।

ইংল্যাণ্ড দলের রক্ষণভাগে ছিলো একজন খেলোয়াড়, মধ্যমাঠে একজন এবং বাকি আটজন আক্রমণভাগে। আর স্কটল্যাণ্ড দলে দু'জন খেলোয়াড় ছিলো রক্ষণভাগে, দু'জন মধ্যমাঠে এবং আক্রমণভাগে বাকি ছয়জন। দু'দলে চোদ্দজন স্ট্রাইকার খেললেও সারা খেলায় গোল হয়নি একটিও। খেলা শেষ হয়েছিলো অমীমাংসিতভাবে ০-০ গোলে।

[] ফুটবল খেলা চলছে, কিন্তু খেলা পরিচালনার জন্যে রেফারী নেই মাঠে, ভাবা যায়? অথচ আগেকার দিনে খেলাগুলোয় কোনো রেফারী থাকতো না। প্রতিপক্ষ দলদু'টোর পক্ষ থেকে থাকতো দু'-জন প্রতিনিধি। তারা খেলায় অংশ নিতো না: তবে প্রয়োজনের সময় খেলা থামিয়ে দিতে পারতো পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে।

□ ১৮৭৪ সালে খেলা পরিচালনার ভার অর্পণ করা হলো রেফারীর ওপরে। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত রেফারীকে থাকতে হতো মাঠের বাইরে। কোনো দলের আবেদনের প্রেক্ষিতেই কেবল তিনি বিতর্ক অবসানে সাহায্য করতেন।

এই বছরই প্রথমবারের মতো রেফারীকে সুযোগ দেয়া হলো মাঠের ভেতরে ঢুকে খেলা পরিচালনা করার। তিনি হাতে পেলেন বাঁশি। এতোদিন বাঁশির পরিবর্তে চিৎকার, ইশারা এবং স্কুলের ঘণ্টার আশ্রয় নিতে হতো।

বাঁশি বাজিয়ে প্রথম যে-খেলাটি পরিচালনা করা হয়েছিলো, সেটাতে অংশ নিয়েছিলো ইংল্যাণ্ডের দু'টি দল—'স্টক সিটি' এবং 'নটিংহাম ফরেস্ট'।

□ ফুটবলের ইতিহাসে ফ্লাডলাইটের আলোয় প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৮৭৮ সালে ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ড শহরের 'ব্রেমেল লেন' স্টেডিয়ামে। খেলাটি সেদিন উপভোগ করেছিলো চোদ্দ হাজার দর্শক।

□ ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত খেলায় প্রথমার্ধ-দ্বিতীয়ার্ধ বলে কিছু ছিলো না। খেলা চলতো একটানা ৯০ মিনিট। ফলে প্রথমার্ধের পর দু'-দলের প্রান্ত বদলের কোনো চলনও ছিলো না।

□ নেটবিহীন গোলবার—আজকের দিনে এটা ভাবা যায়? অথচ ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গোলবারের পেছনে নেট লাগাবার বুদ্ধি মাথায়

আসেনি কারুর। সেই সময় মাছ ধরার জাল, বড়শি ইত্যাকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক এক কোম্পানির মালিক মিস্টার ব্রডি গোলপোস্টের পেছনে নেট লাগাবার প্রস্তাব দেন। মিস্টার ব্রডির বাড়ি ছিলো ইংল্যাণ্ডের লিভারপুলে।

গোলবারে নেট লাগিয়ে প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে। সেই খেলায় অংশ নিয়েছিলো উত্তর ইংল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড। নেটের ব্যবহার খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে ইংল্যাণ্ডসহ ইউরোপের নানান দেশে।

মিস্টার ব্রডির কোম্পানি ফুটবলের নেট তৈরি করে চলেছে আজও অব্দি।

□ পেনাল্টি কিক মানে অপরাধের দণ্ড হিসেবে যে-কিকের সুযোগ পেয়ে থাকে প্রতিপক্ষ দল—সাধারণভাবে আমরা সেটাই জানি। কারণ; ইংরেজি শব্দ 'পেনাল্টি'-র বাংলা প্রতিশব্দ হলো শাস্তি বা দণ্ড।

কিন্তু 'পেনাল্টি কিক' কথাটার উৎপত্তি আসলে আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফুটবলের নিয়ম-কানুন বিশেষজ্ঞ জন পেনাল্টির নাম থেকে। স্বীয় দলের রক্ষণসীমার ভেতরে কোনো খেলোয়াড়ের বিপজ্জনক খেলা, নোংরা আক্রমণ বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে খেলার শাস্তিস্বরূপ ১৮৯১ সালে এই নিয়মের প্রস্তাবনা করেন জন পেনাল্টি।

এই বছরই আয়ারল্যাণ্ড ফুটবল লীগে প্রথমবারের মতো 'পেনাল্টি কিক' নিয়মটি প্রয়োগ করা হয়।

□ ক্রিকেটে যেমন খেলোয়াড়েরা চিৎকার করে আম্পায়ারের কাছে আবেদন করে, আগে ফুটবলারেরা সেভাবে চেঁচিয়ে আবেদন করতো রেফারীর কাছে। ১৮৯৪ সালে রেফারীর কাছে আপীল করার প্রথা বাতিল ঘোষণা করা হয়।

□ একেক দলে কতোজন খেলোয়াড় খেলবে, সেটা আগে নির্ধারণ করা হতো প্রতিদ্বন্দ্বী দলদু'টোর চুক্তির মাধ্যমে। ১৮৯৭ সালে প্রথম আইন করা হয়, প্রতিটি দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা হবে ১১। খেলা চলাকালীন কোনো খেলোয়াড় আহত হলে দলটিকে কম সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়েই খেলা চালিয়ে যেতে হতো। কারণ, খেলোয়াড়-বদলের নিয়মের প্রবর্তন হয়নি তখনও।

□ ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালের ২১শে মে ফ্রান্সের প্যারিসে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং সুইডেনের ৬ টি দেশের ৭ জন প্রতিনিধি ? ফুটবল ফেডারেশনগুলোর সাতজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্থাপিত হয় ফিফা।

□ বর্তমানে ফিফায় রয়েছে ১৫০ টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি।

ফিফার সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত ছিলো: গোলরক্ষকের জার্সি বাকি সব খেলোয়াড়ের জার্সির চেয়ে আলাদা হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবের মুখ দেখে পাঁচ বছর পর।

□ বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল খুবই শক্তিশালী। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো বিশ্বকাপ জিতেছে ইউরোপের দেশগুলোর

চেয়ে বেশি বার। অথচ দক্ষিণ আমেরিকায় আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রচলন শুরু হয় ১৯০৫ সালে—ইউরোপের ৩৩ বছর পরে। সেখানে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করে উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা জাতীয় দল।

১৯১৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

☐ ফুটবলের প্রথম রেডিও-ধারাবর্ণনার আয়োজন করা হয়েছিলো ১৯২৬ সালে। মধ্য ইউরোপ কাপ টুর্নামেন্টে হাঙ্গেরির 'এম টি কে' দল বনাম চেকোশ্লাভাকিয়ার 'স্লাভিয়া' দলের খেলার ধারাবিবরণী দেন চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার লাউফের।

ফুটবল ম্যাচ টেলিভিশনে প্রথমবারের মতো সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো ১৯৩৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

☐ ফুটবল খেলা চলছে, অথচ ফুটবলারদের জার্সির গায়ে নম্বর লেখা নেই—এটা এখন অকল্পনীয়, অথচ ১৯৩৩ সালের আগে পর্যন্ত জার্সিতে নম্বর লেখার প্রচলন ছিলো না। এ-বছরই এফ. এ. কাপের খেলোয়াড়েরা প্রথমবারের মতো জার্সিতে নম্বর ব্যবহার করে।

☐ প্রথমে যে ১১ জন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামলো কোনো দল, সেই দলকে সেই ক'জন খেলোয়াড় নিয়েই খেলা চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত—সেটাই ছিলো নিয়ম ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। কোনো

খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করা হলে বা কেউ আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে গেলে কম সংখ্যক ফুটবলার নিয়েই খেলা চলত। ১৯৫৪ সালে নিয়ম করা হলো, আহত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলার মাঠে ফিরে আসতে পারবে রেফারীর অনুমতিসাপেক্ষে।

☐ আহত হয়ে কোনো খেলোয়াড় খেলার অযোগ্য হয়ে পড়লেও খেলোয়াড়-বদলের প্রথা চালু ছিলো না ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে খেলোয়াড় বদলের যে-নিয়ম (খেলার যে-কোনো সময় একটি দল তাদের দু'জন খেলোয়াড়কে বদল করতে পারবে), সেটার প্রচলন হয় ১৯৬৭ সাল থেকে।

ফুটবলে কনিষ্ঠ খেলোয়াড়শ্রেষ্ঠ

কম বয়সে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের ব্যাপার। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ফুটবলরাই জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন খুব অল্প বয়সে। আঠারো বছর পূর্ণ হবার আগেই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামেন যে সব ফুটবলার, তাঁদের তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো।

জাতীয় দলের হয়ে জীবনের প্রথম খেলতে নেমে নরওয়ের বিরুদ্ধে গোল করে বসেন পোল্যাণ্ডের লুবানস্কি। হাঙ্গেরিয়ান আলবার্ট প্রথম খেলায় গোল না পেলেও দ্বিতীয় খেলায় পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে চার-চারজন ডিফেণ্ডারকে অনায়াসে কাটিয়ে বিজয়-সূচক গোলটি করেন। তাঁর বয়স তখন ১৮ বছর ২ মাস। হাঙ্গেরি সেই খেলায় জয়লাভ করে ৪-৩ গোলে।

ম্যারাডোনা	আর্জেন্টিনা	১৬ বঃ ৩ মাস ২৫ দিন
লুবন্স্কি	পোল্যাণ্ড	১৬ বঃ ৬ মাস ৬ দিন
পেলে	ব্রাজিল	১৬ বঃ ৯ মাস ১৬ দিন
রিভেরা	ইতালি	১৭ বঃ ৮ দিন
লেখ	ফ্রান্স	১৭ বঃ ২২ দিন
হোয়াইটসাইড	উঃ আয়ারল্যাণ্ড	১৭ বঃ ১ মাস ১২ দিন
ভান হিম্স্ত	বেলজিয়াম	১৭ বঃ ৩ মাস ৫ দিন
বেক	যুগোশ্লাভিয়া	১৭ বঃ ৬ মাস ১৬ দিন
পোদ্রুইয়া	যুগোশ্লাভিয়া	১৭ বঃ ৭ মাস ৪ দিন
আলবার্ট	হাঙ্গেরী	১৭ বঃ ৯ মাস ১২ দিন
বেনে	হাঙ্গেরী	১৭ বঃ ৯ মাস ২৭ দিন
জিলের	পশ্চিম জার্মানী	১৭ বঃ ১১ মাস ১১ দিন

বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার জর্জ বেস্ট ১৮ বছর বয়সে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান এবং ২৩ বছর বয়সে 'গোল্ডেন বল' পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ থাকে যে, ১৯৫৬ সাল থেকে ফ্রান্সের ক্রীড়া-পত্রিকা 'ফ্রান্স ফুটবল' প্রতি বছর ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ভাষ্যকারদের নির্বাচিত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে 'গোল্ডেন বল' দিয়ে পুরস্কৃত করে থাকে।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অপর ফুটবলার নরম্যান হোয়াইটসাইড ১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন ওই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম বয়সী ফুটবলার হিসেবে। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বছর ১ মাস ১২ দিন।

১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের ফুটবল অঙ্গন নতুন এক তরুণের আবির্ভাবে সরগরম হয়ে ওঠে। ১৭ বছর বয়সী পল ভান হিম্‌স্ত জাতীয় দলের হয়ে প্রথম খেলায় জয়সূচক গোল করেন হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। বেলজিয়াম জয়লাভ করে ২-১ গোলে। 'বেলজিয়ামের সেরা ফুটবলার' আখ্যা পান তিনি সেই বছরেই।

'সান্টোস' ক্লাবে পেলের সতীর্থ খেলোয়াড় কাউতিনিও পেশাদার ফুটবল দলের সাথে চুক্তিতে আসেন ১৫ বছর বয়সে। এবং ১৮ বছর বয়সে ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান।

১৯ বছর বয়সে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে শুরু করে পরবর্তীতে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্কটল্যাণ্ডের লো, পেরুর কুবিলাস, হাঙ্গেরির পুস্‌কাস, ব্রাজিলের এডু এবং অন্যান্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সের্গেই রদিয়োনভ ১৯৮০ সালে হাঙ্গেরি সোভিয়েত ইউনিয়ন ম্যাচে খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে মাঠে নামেন। সেদিন তাঁর বয়স ১৭ বছর ১১ মাস ১২ দিন। খেলতে নেমে এক মিনিট পরেই তিনি গোল করলে খেলার ফলাফল হয় ৪-১, সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে।

আঠারো বছর বয়সে ইংল্যাণ্ড জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামেন জিমি গ্রিভ্‌স। এবং দেড় বছর পরে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর দেয়া গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯-এ। আড়াই বছরের কিছু বেশি সময়ে তিনি ইংলিশ লীগে ১০০টি গোল দেবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

'ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড' দলের লিংকম্যান এডওয়ার্ড ডানকান ১৯৫৫ সালে ১৮ বছর ৬ মাস বয়সে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফ্রান্স-

ইংল্যাণ্ড খেলায় প্রথম খেলতে নেমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। ২০ বছর বয়সে তিনি 'ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার' তালিকায় দখল করেন তৃতীয় স্থান। বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২১ বছর বয়সে।

ইতালির সান্দ্রিনো ম্যাজোলা জাতীয় দলের হয়ে প্রথম খেলার সুযোগ পান যখন তাঁর বয়স ২০ বছর ৬ মাস। খেলাটি ছিলো বিশ্ববিখ্যাত ব্রাজিল দলের বিরুদ্ধে যারা ইতিমধ্যে দু'বার বিশ্ব-কাপ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে। দলে তখন খেলতেন ফুটবলের রাজা পেলে। খেলায় ইতালি দল একটি পেনাল্টি লাভ করে। দলের নবাগত খেলোয়াড় ম্যাজোলা নিখুঁত এবং নির্ভুল-ভাবে পেনাল্টি কিক করে ইতালির অবিস্মরণীয় বিজয়কে (৩-০) ত্বরান্বিত করেন। দুই বছর পর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নস কাপের ফাইনাল খেলায় স্পেনের 'রিয়াল মাদ্রিদের' বিরুদ্ধে দুটি গোল করে নিশ্চিত করেন নিজদল 'ইন্টার' ক্লাবের চ্যাম্পিয়নশিপ।

আর্জেন্টিনার ডি স্টিফানো ২১ বছর বয়সে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে সাউথ আমেরিকান কাপে খেলতে আসেন। ছটি মাত্র খেলায় খেলতে নেমে ছটি গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোল-দাতার সম্মান অর্জন করেন তিনি।

ফুটবলে কৌশলের ক্রমরূপান্তর

১৮৬০ : ফুটবলের বাল্যকাল। এখন ছোট ছেলেরা বল নিয়ে যেমন দাবড়ে বেড়ায়, তখনকার ফুটবল ছিলো তেমনি। গোলকীপার ছাড়া আর সকলেই স্ট্রাইকার, লক্ষ্য একটাই—গোল দেয়া।

□ ১৮৬৩ : স্কটল্যাণ্ডবাসীরা সবার আগে লক্ষ্য করলো—ফুটবল মাঠটি বিশালাকার, সারা মাঠে পুরোটা সময় দৌড়ে বেড়ানো অতো সহজ কথা নয় ; খেলার শেষের দিকে সবাই নেতিয়ে পড়ে। শক্তি এবং সামর্থ্যকে অপচয় না করে সঞ্চয়ে রাখার চিন্তাটা প্রথম আসে তাদের মাথাতেই। গোল দেয়াটা প্রধান লক্ষ্য হলেও নিজের বারে বল ঢুকতে না দেয়ার জন্যেও সমপরিমাণ চেষ্টা করা দরকার। এই সময়েই মাঠে শ্রমের বণ্টন এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানোর ধারণার উৎপত্তি। ডিফেন্সে দাঁড় করানো হলো দু'জনকে—আগে

আর পেছনে। একজন সারাক্ষণ ডিউটি দিয়ে বেড়াবে বারের সামনে, ইংরেজীতে তখন একে বলা হতো 'গোল-কভার।' অন্যজনের কাজ ছিলো আজকের লিংকম্যানের মতো।

☐ ১৮৭২ : স্কটল্যাণ্ডবাসীরা আরো লক্ষ্য করলো, খেলার সময় ডিফেন্সের দুই পাশে দুই উইং-এ শূন্যস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতিপক্ষ সেদিক দিয়েই আক্রমণ করছে তেড়েফুঁড়ে। এই ফাঁকটা বন্ধ করা দরকার। স্ট্রাইকার পজিশন থেকে দু'জনকে নামিয়ে আনা হলো লেফট উইং ব্যাক এবং রাইট উইং ব্যাক হিসেবে।

☐ ১৮৮০ : এই সময়ে আক্রমণভাগ এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের সংখ্যা সমান সমান হলো। ইংল্যাণ্ডের 'নটিংহাম ফরেস্ট' ক্লাব তাদের দশজন খেলোয়াড়কে (গোলরক্ষক বাদে) দুইভাগে ভাগ করে ব্যালান্স আনলো আক্রমণে এবং রক্ষণে। পাঁচজন আক্রমণে আর ব্যাক এবং হাফব্যাক মিলিয়ে পাঁচজন রক্ষণভাগে। এভাবেই জন্ম নিলো সেকালের ক্লাসিক ফর্মুলা : ১-২-৩-৫, এটা প্রায় পঞ্চাশ বছর জনপ্রিয় এবং প্রচলিত ছিলো নানা দেশে।

☐ ১৯২৫ : দেখা গেল, মধ্যমাঠের ঠিক মাঝখানের খেলোয়াড়টি যেন তার দলের খেলার ধারা নিয়ন্ত্রণ করছে—যাকে বলা হয় গেম-মেকার। এই পজিশনে খেলছে অতি প্রতিভাবান খেলোয়াড়। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রাও তার কাছ থেকে আশা করছে অনেক বেশি। ফলে তার ওপরে চাপ পড়ছে অস্বাভাবিক। এই সমস্যার

মোকাবেলা করতে দু'জন ইনসাইড হাফব্যাককে তার দু'পাশে দাঁড় করানো হলো। খেলার পদ্ধতি যেটা দাঁড়ালো, সেটা এরকম : গোলকীপার, দু'জন ব্যাক, দু'জন হাফব্যাক, সেন্ট্রাল হাফব্যাক, দু'জন ইনসাইড হাফব্যাক এবং তিনজন ফরোয়ার্ড।

□ ১৯৩০: এই বছর অফসাইডের ধারা বদলে গেলে খেলার পদ্ধতিও বদলে যায় স্বাভাবিক কারণেই। আগে একজন খেলোয়াড় অফ-সাইড ট্র্যাপে পড়তো তার সামনে বিপক্ষদলের তিনজনের কম খেলোয়াড় থাকলে। এখন সংখ্যাটাকে তিন থেকে চয়ে নিয়ে আসায় প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডরা আগের চেয়ে বেশি উদ্যমে গোলবারের দিকে হানা দিতে লাগলো। দুজন ব্যাক এই আক্রমণের ভার সইতে পারছিলো না। ব্যাকের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হলো তিন। সাম-নের দু'জন হাফব্যাককে মিলিয়ে তাদের অবস্থান হলো ইংরেজী অক্ষর M-এর মতো। আর ফরোয়ার্ডগুলোসহ এই পদ্ধতি নাম পেলো WM, সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করলে যা হয় এরকম : ১-৩-২-২-৩।

□ ১৯৩৫ : লক্ষ্য করা গেল, প্রতিপক্ষের আক্রমণ রচিত হচ্ছে মূলত সেন্টার ফরোয়ার্ডের মাধ্যমে। তাই অস্ট্রিয়ান ফুটবলবিশেষজ্ঞ পাপান প্রস্তাব দিলেন যে, মূল সেন্টার ফরোয়ার্ডকে সারাক্ষণ পাহা-রায় রাখবে একজন স্টপার, এবং আর একজন স্টপার, যার দায়িত্ব পুরো রক্ষণ এলাকায় নজর রাখা, তার প্রধান কাজের পাশাপাশি ওই স্টপারকে সহায়তা করবে প্রয়োজনবোধে। দু'জন হাফব্যাককে

নামিয়ে আনা হলো ব্যাক হিসেবে, সেন্ট্রাল হাফব্যাক থেকে গেল তার পুরনো জায়গায়, তার সাহায্যকারী হিসেবে দু'পাশে রইলো দু'জন ইনসাইড হাফব্যাক। রক্ষণমূলক নীতি অনুসরণ করে খেলার উদ্দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বেশ সুফল এনেছে, বিশেষ করে যখন বিজয়ের আশা এবং সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

☐ ১৯৫২ : পদ্ধতি ১-৪-২-৪ যদিও ব্রাজিলীয় বলে পরিচিত, আসলে এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব হাঙ্গেরির। এই পদ্ধতিতে অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করা হয়, যার ফলে দলের দুজন ফরোয়ার্ডকে মোকাবেলা করতে হয় প্রতিপক্ষের একজন ডিফেণ্ডারকে। কাগজে-কলমে এই কৌশল আবিষ্কার করে হাঙ্গেরীয়রা তাদের খেলায় এটা প্রয়োগ করে। ১৯৬৩ সালে হাঙ্গেরি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করে নাস্তানাবুদ করে ফেলে ইংল্যাণ্ডকে। ইংল্যাণ্ড তখন খেলতো WM পদ্ধতিতে। কিন্তু হাঙ্গেরীর নতুন পদ্ধতির কাছে হার মেনে ইংল্যাণ্ড দল নিজের মাঠে ৩-৬ গোলে পরাজিত হয়।

☐ ১৯৫৮ : ১-৪-২-৪ পদ্ধতির উৎকৃষ্টতম প্রয়োগ প্রদর্শন করে ব্রাজিল। তাদের এই প্রয়োগ এতো নিখুঁত এবং অনবদ্য হয়েছিলো যে পদ্ধতির আবিষ্কার বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয়নি। ফলে এই পদ্ধতি পরিচিতি লাভ করে ব্রাজিলীয় পদ্ধতি হিসেবে। দুই উইং ব্যাকের ওভারল্যাপিং ব্রাজিলই প্রবর্তন করে। তাদের দলে ছিলো রক্ষণ এবং আক্রমণের অভূতপূর্ব সমন্বয়। আর থাকবেই

না বা কেন, যখন সে দলে ছিলেন পেলে, অরলান্দো, বেলিনি, জিতো আর ভাভার মতো কুশলী এবং দক্ষ খেলোয়াড়রা ?

□ ১৯৬৩ : ব্রাজিলের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে খেলতে আবিষ্কার করা হলো পাল্টা পদ্ধতি। চারজন ডিফেণ্ডার তো রাখা হলোই প্রতিপক্ষের চারজন ফরোয়ার্ডকে রুখতে, সেই সঙ্গে গোলবারের সামনে সারাক্ষণ পাহারা দেবার দায়িত্ব রইলো আরেকজনের ওপরে। অতিরিক্ত সাবধানতার লক্ষ্যেই এই পদ্ধতির অবলম্বন। এই পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষের আক্রমণের ধার বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু পাল্টা-আক্রমণ সহজতর হয়ে উঠে। অর্থাৎ, রক্ষণমূলক খেলা খেলেও বিজয়ের প্রত্যাশা করা যেতে পারে দ্রুত ও ফলপ্রসূ পাল্টা আক্রমণের ওপরে নির্ভর করে। ইউরোপের অনেক দলকে এখনও এই কৌশলে খেলতে দেখা যায়।

□ ১৯৬৬ : এই সময়ে প্রচলিত হয় ১-৪-৩-৩ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লিংকম্যানরা আক্রমণ রচনায় বেশি সহায়ক হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই কৌশল অবলম্বন করে খেলে ইংল্যাণ্ড এই বছরে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ইউনিভার্সেল ফুটবলার তৈরির ধারণা জেগে ওঠে এই সময়ে। অনবরত স্থান বদল করে খেলা, প্রয়োজনে নিচে নেমে এসে রক্ষণভাগকে সহায়তা করা কিংবা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আক্রমণে সক্রিয় অংশ নেয়ার ক্ষমতাধারী খেলোয়াড়কে বলা হয় ইউনিভার্সেল ফুটবলার।

*

□ ১৯৬৮ : ১-৪-৩-৩ সিস্টেমের পাশাপাশি প্রচলন পেলো ১-৪-৪-২ সিস্টেম। আপাতভাবে এই পদ্ধতিটিকে ব্যালান্সড বলে মনে হয় না। কিন্তু দলে ইউনিভার্সেল ফুটবলারের সংখ্যা বেশি থাকলে এই পদ্ধতিটি খুবই ফলদায়ক। কারণ, আক্রমণে অংশ নিতে পারে মোট আটজন ফুটবলার (দুই উইংব্যাকসহ)। রক্ষণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এই কৌশলের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিলো কেবল উচুমানের ফুটবল দলগুলোর ভেতরে।

□ ১৯৭৪ : এই বছর পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে হল্যাণ্ড জন্ম দিলো টোটাল ফুটবলের। সত্তর দশকের গোড়ায় ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দুই ফুটবল দল আয়াক্স এবং ফেইয়েনোরদমের খেলোয়াড় সমৃদ্ধ হল্যাণ্ড দল টোটাল ফুটবল প্রদর্শন করে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। খুব সংগঠিত উপায়ে পরিচ্ছন্ন খেলা তারা উপহার দিলো ফুটবলামোদীদের। তাদের আকস্মিক স্থান পরিবর্তন, প্রত্যেক মুহূর্তে বলের চারধারে আশাতীত সংখ্যক ফুটবলারের উপস্থিতিতে অনায়াসে ঘায়েল হতে লাগলো প্রতিপক্ষ। অতি উঁচুমানের টেকনিক এবং কয়েকজন দক্ষ ইউনিভার্সেল ফুটবলারসমৃদ্ধ এই দলে তখন খেলতেন ক্রয়ুফ, নিস্কেন্স, ক্রোল, সারবিয়েরের মতো বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়েরা।

□ ১৯৮৪ : ১৯৭৮ এবং ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার কৌশল এবং পদ্ধতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আনেনি কিংবা উন্নয়ন সাধন করতে পারেনি। ইউরোপের বাঘা বাঘা কোচরা সিদ্ধান্তে

এলেন যে, প্রতিপক্ষের দুজন ফরোয়ার্ডের জন্যে নিজ রক্ষণভাগে চারজন ব্যাক রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ফ্রান্স এবং ডেনমার্কের কোচ তাঁদের দলকে নতুন করে সাজালেন। ডিফেন্স থেকে একজনকে নিয়ে আসা হলো মধ্যমাঠে। ফলে পদ্ধতিটি হলো এরকম : ১-৩-৫-২। বলাবাহুল্য, ফ্রান্স এবং ডেনমার্কের খেলা সেসময়ে সকলের দৃষ্টি কাড়ে এবং ফ্রান্স ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন-শিপ লাভ করে।

১৯৮৬ : এই বছরের বিশ্বকাপও কৌশলগত দিক থেকে নতুন তেমন কিছু উপহার দিতে পারেনি। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, অধিকাংশ ফুটবল দলই রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেছে। কারণ অধিকাংশ দলেই দু'জনের বেশি সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলো না। কিন্তু সোভি-য়েত ইউনিয়ন দল একজন মাত্র ফরোয়ার্ড দিয়ে তুমুল আক্রমণাত্মক খেলা খেলে (চার খেলায় বারো গোল) প্রমাণ করেছে, তাদের আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতিটি (১-৪-৫-১) যথেষ্ট ফলদায়ক। অনেক বিশে-ষজ্ঞ এই পদ্ধতিটিকে অভিহিত করেছেন 'আগামী শতকের পদ্ধতি' হিসেবে।

ফুটবলের অবাক সন্দেশ

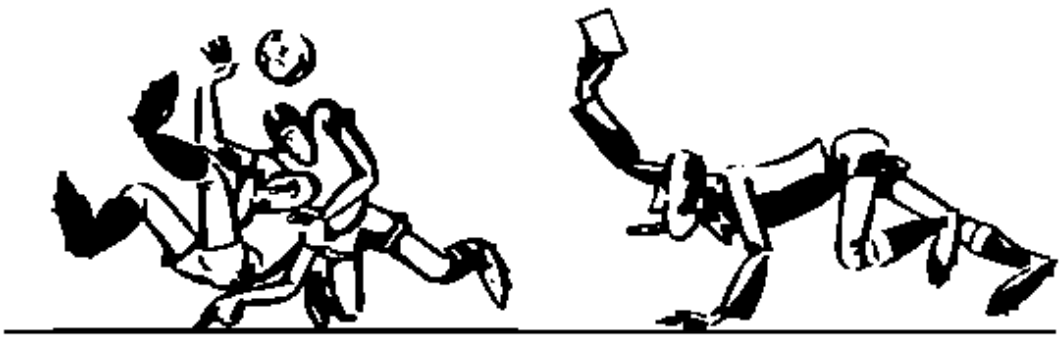

মনে হয় যেন অবিশ্বাস্য

আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাড়ে তিন মিনিট সময়ে হ্যাট্রিক করাটা আপাতভাবে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ১৬ই নভেম্বর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় ইংল্যাণ্ডের উইলি হল সাড়ে তিন মিনিটে তিনটি গোল করে যে-অসাধ্য সাধন করেছেন, সেটার পুনরাবৃত্তি, সম্ভবত, আর হবে না কখনও।

জনসমুদ্র

শুধু ব্রাজিলেই সম্ভব। ১৯৫০ সালে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা দেখতে রিওডি জেনিরোর 'মারাকানা'। স্টেডিয়ামে দর্শকসমাগম হলো ২ লাখ ৫ হাজার! তাদের মধ্যে ৬ হাজার ১৫৫ জন টিকেট ছাড়াই ঢুকে পড়েছিলো স্টেডিয়ামে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং বিপদাশঙ্কা কমাতে বর্তমানে স্টেডিয়ামটির ধারণ-ক্ষমতা ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৯৫ জনে কমিয়ে আনা হয়েছে। নতুন প্রোজেক্ট অনুযায়ী আসন সংখ্যা আরো কমিয়ে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১২০ করার কথা।

নিজ বাসভূমে

নিজের মাঠে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্যায়ের কোনো খেলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দল কখনও পরাজিত হয়নি। এমন নজির পৃথিবীর আর কোনো দেশের নেই।

হলুদ কার্ডেও চ্যাম্পিয়ন

১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল ইতালি আর একটি ব্যাপারেও অন্য সব দলের তুলনায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো। গোটা টুর্নামেন্টে তারা হলুদ কার্ড পেয়েছিলো ১১টি !

এই বিশ্বকাপে ইউরোপের ১৫ টি দলকে হলুদ কার্ড দেখানো হয় ৮৯ বার, বাকি ৯টি দলকে দেখানো হয় ৩৫ বার।

নয়ের বেশি নয়

বিশ্বকাপের খেলায় আজ পর্যন্ত নয় গোলের বেশি ব্যবধানে জয়ী হতে পারেনি কোনো দল। এমন ঘটনা ঘটেছে মাত্র তিনবার। দু'বার সেটা ঘটিয়েছে হাঙ্গেরি। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়াকে তারা হারায় ৯-০ গোলে এবং ১৯৮২ সালে সালভাদরকে হারায় ১০-১ গোলে। আরেকবার ১৯৭৪ সালে যুগোস্লাভিয়া ৯-০ গোলে পরাজিত করে জাইরকে।

১৯৩৮ সালে সুইডেন কিউবাকে ৮-০ গোলে হারিয়ে দেয়। ১৯৫০ সালে সমান-সংখ্যক গোলে বলিভিয়াকে হারায় উরুগুয়ে।

অল্পের জন্যে

লীগের প্রতিটি খেলায় জেতা এবং একটিও গোল না খাওয়া অসাধারণ কৃতিত্বই বটে। ফুটবলের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছিলো একবারই।

১৯০১ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ফুটবল লীগে আইরিশ রাইফেল্‌স

ক্লাব লীগের প্রতিটি খেলায় জয়লাভ করেছিলো এবং সারা লীগে তারা একটি গোলও হজম করেনি।

১৯৭২ সালে ভারতের ইস্টবেঙ্গল দল এই অনন্য রেকর্ডটি অল্পের জন্যে স্পর্শ করতে পারেনি। সে-বছর তারা ১৯টি খেলার মধ্যে ১৮ টিতে জয়লাভ করে এবং ড্র করে একটি খেলায়। প্রতিপক্ষকে গোল দেয় তারা ৪৪ টি, পক্ষান্তরে নিজেদের গোল খাবার ঘর শূন্য। মাত্র একটি খেলায় ড্র করার জন্যে আইরিশ দলটির অনন্য রেকর্ডটির যুগ্ম দাবিদার হতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল দল।

প্রমীলা বিশ্বকাপ

১৯৭০ সালে ইতালিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বকাপ প্রমীলা ফুটবল। তবে টুর্নামেন্টটি ছিলো আনঅফিসিয়াল। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় ডেনমার্ক, রানার্স আপ হয় স্বাগতিক দেশ ইতালি। ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় তুরিন স্টেডিয়ামে। তবে উৎসাহী দর্শকের সংখ্যা এতো বেশি ছিলো যে, সবার স্থান সংকুলান হয়নি স্টেডিয়ামে।

গোলের যোগী

আয়ারল্যাণ্ড জাতীয় দলের স্ট্রাইকার জন ওল্ডরিজ খেলেন ইংল্যাণ্ডের 'লিভারপুল' ক্লাবে। ইংল্যাণ্ড লীগে তিনি তুখোড় গোলদাতা। অথচ জাতীয় দলের হয়ে খেলে গোল পান না কিছুতেই। তিন বছরে তিনি ২০টি খেলায় জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে এক-

বারও বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি।

২১তম খেলায় তিনি প্রথম গোল করেন। তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে।

বিশ্বকাপ ট্রফি

বিশ্বকাপটি তৈরি আঠারো ক্যারাট সোনা দিয়ে। উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি, ওজন ১১ পাউণ্ড। মূল্য ৪০ লাখ ডলার।

অশেষ

১৯৬২ সালে ব্রাজিলে 'স্যান্টোস' এবং 'পনারল' দলের মধ্যে খেলা চলেছিলো পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা! খেলাটি শুরু হয়েছিলো রাত সাড়ে ন'টায় এবং শেষ হয়েছিলো রাত একটায়।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ ম্যাচ এবং এটাই এক-মাত্র ফুটবল ম্যাচ যেটি দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো (২রা এবং ৩রা অগাস্ট)।

খেলাটি ড্র হয়েছিলো ৩-৩ গোলে।

সব-পেয়েছির বছর

১৯৮২ সাল ইতালির পাওলো রোসির জন্যে ছিলো একটি স্বপ্নের বছর। ফুটবলের যাবতীয় সম্মানজনক উপাধি এবং পদক তিনি লাভ করেন এ বছরেই: বিশ্বকাপে স্বর্ণপদক, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোল-দাতা, বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার, মহাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার। ফুটবলের ইতিহাসে এমন সৌভাগ্য আর

কারো ভাগ্যে জোটেনি।

এখানেও আমেরিকা

আমেরিকায় ফুটবল খেলার প্রসার খুবই কম। ফুটবলের জনপ্রিয়তা ওখানে নেই বললেই চলে। অথচ আমেরিকার একজন ফুটবলারই বিশ্বকাপের প্রথম গোল করার সৌভাগ্য অর্জন করে। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে আমেরিকার ম্যাক্‌গী বিশ্বকাপের সর্বপ্রথম গোল করেন আমেরিকা-বেলজিয়াম খেলায়।

বিশ্বকাপে দ্রুততম গোল

বিশ্বকাপে দ্রুততম গোলের রেকর্ড ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান রবসনের। ১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি গোল করেন ২৭ তম সেকেণ্ডে। ১৯৩৮ সালে সুইডেনের নিউবার্গ ৩০তম সেকেণ্ডে গোল করেছিলেন হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। ইতালির বিরুদ্ধে খেলায় ফ্রান্সের লিয়াকম্ব ৩৮ তম সেকেণ্ডে গোল করেছিলেন ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে।

হৃদয়বিদারক

মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে নাটকীয়ভাবে হেরে ব্রাজিল দল টুর্নামেণ্ট থেকে বিদায় নিলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় ব্রাজিলের ৪ জন সমর্থক। আরেকজন মারা যায় ঝগড়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে। এছাড়া আরো শতাধিক সমর্থককে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। তাদের সকলের হৃদযন্ত্রে গণ্ডগোল

দেখা দিয়েছিলো।

গোলমেশিন

একটি বিশ্বকাপে ব্যক্তিগতভাবে স্কোরিং-এর সর্বোচ্চ রেকর্ড—১৩ গোল। ফ্রান্সের বিখ্যাত স্ট্রাইকার হিউস্ত ফনতেন ১৯৭৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ১৩টি গোল করেযে রেকর্ড সৃষ্টি করেন, তা আজও অক্ষুন্ন আছে। ১৩টি গোল তিনি করেছিলেন মাত্র ৬টি খেলা খেলে।

সমাপ্তি ও সূচনা

এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের সর্বশেষ গোলটি করেছিলেন ইতালির আলতোবেলি। ১৯৮৬ সালের বিশ্ব-কাপের প্রথম গোলটিও এলো তাঁরই পা থেকে।

সফলতম প্রশিক্ষক

জাতীয় দলের প্রশিক্ষক হিসেবে সবচেয়ে সফল হলেন পশ্চিম জার্মা-নির হেলমুট শোয়েন। তাঁর প্রশিক্ষণে পশ্চিম জার্মানি দ[illegible] সাফল্যই প্রমাণ করে দেয় সে-কথা:

১৯৬৬-বিশ্বকাপ-রানার্স আপ
১৯৭০-বিশ্বকাপ-তৃতীয়
১৯৭২-ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ-চ্যাম্পিয়ন
১৯৭৪-বিশ্বকাপ-চ্যাম্পিয়ন
১৯৭৬-ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ-দ্বিতীয়।

অন্যতম সফল কোচ হিসেবে সুইডেনের জর্জ রেনরের নাম করা যেতে পারে। তাঁর যোগ্য প্রশিক্ষণে সুইডেন দল যে-সব উল্লেখ-যোগ্য সফলতা লাভ করে, সেগুলো হলো :

১৯৪৮-অলিম্পিক ফুটবল-চ্যাম্পিয়ন

১৯৫০-বিশ্বকাপ-তৃতীয়

১৯৫২-অলিম্পিক ফুটবল-চ্যাম্পিয়ন

১৯৫৮-বিশ্বকাপ-দ্বিতীয়

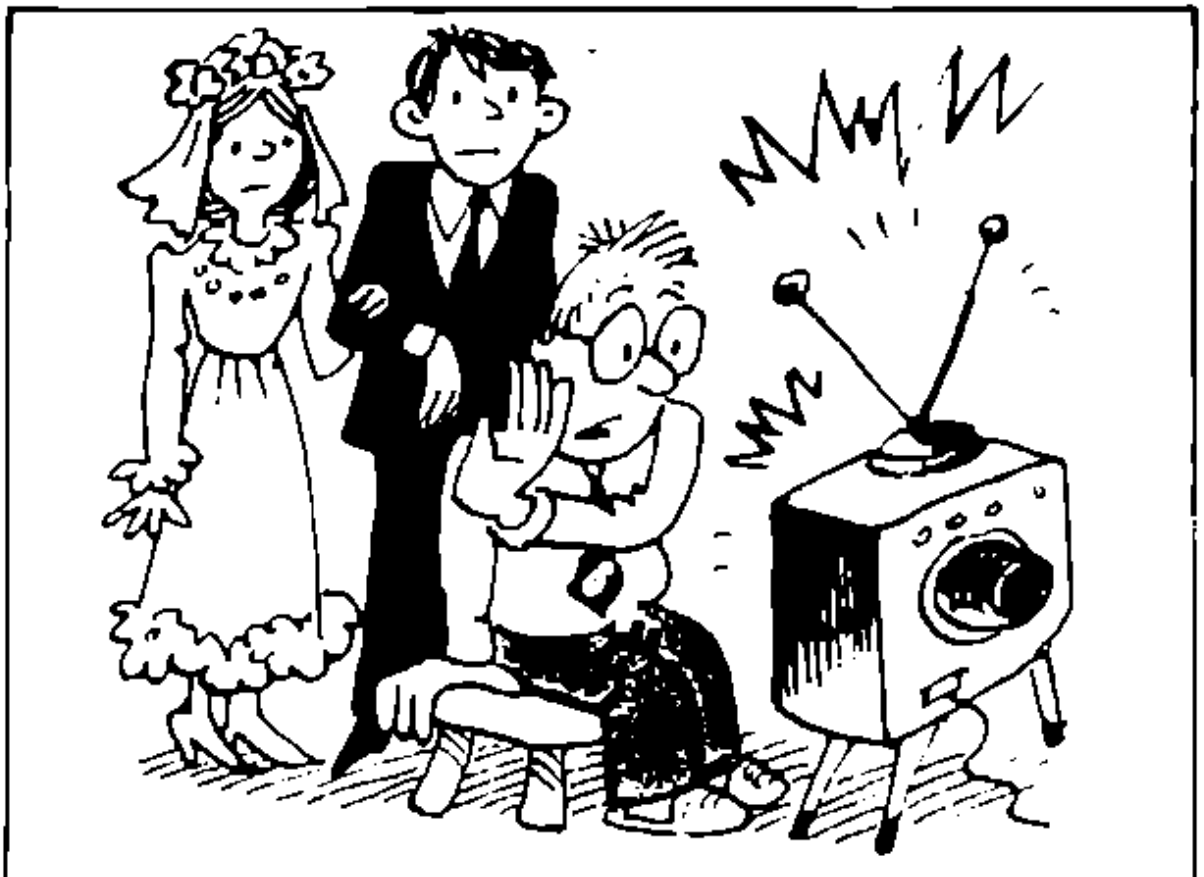

-- বাবা, এসো আমার স্ত্রীর সাথে আলাপ করিয়ে দিই।
— দাঁড়া, দাঁড়া, হাফটাইম হতে দে!

গোলোৎসব

অস্ট্রিয়া-সুইজারল্যাণ্ডের খেলা চলছিলো ১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপে। প্রথমার্ধের পর খেলার ফলাফল দাঁড়ালো ৫-৪ গোল অস্ট্রিয়ার অনুকূলে। অর্থাৎ ৪৫ মিনিটে ৯ গোল! খেলাটিতে ৭-৫ গোলে জয়ী হয়েছিলো অস্ট্রিয়া।

১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ইতালি-পশ্চিম জার্মানির খেলার ৯০ মিনিট খেলা শেষ হলো ১-১ গোলে। অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময়ে খেলে হলো ৫টি! খেলায় ৪-৩ গোলে জিতলো ইতালি।

একাই দশ

১৯১২ সালের অলিম্পিকে জার্মানির গোটফ্রীড ফুখ্‌স একাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন ১০টি! সেই খেলায় জার্মানি জিতেছিলো ১৬-০ গোলে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেণ্টে ব্যক্তিগত স্কোরিং-এ এটাই রেকর্ড।

একচেটিয়া

এ-পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২০টি অলিম্পিকের (যদিও ২৪তম অলিম্পিক হয়ে গেছে, তবু ৩টি অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বিশ্বযুদ্ধের কারণে, আর একটিতে ফুটবল অন্তর্ভুক্ত ছিলো না) ফুটবল টুর্নামেণ্টে ইউরোপীয় দেশগুলো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৭ বার, রানার্স আপ হয়েছে ১৬ বার!

আরো বলে রাখা উচিত, ১৯০৪ সালের অলিম্পিক ফুটবলে ইউরোপের কোনো দেশ অংশ নেয়নি।

দুর্গম দুর্গ

১৯৮০ সালের ২৩ মে থেকে ১৯৮৫ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতীয় ফুটবল দল নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত আঠারোটি খেলার একটিতেও পরাজিত হয়নি বা ড্র করেনি। এই খেলাগুলোয় প্রতিপক্ষকে তারা সর্বমোট ৪৩টি গোল দিলেও নিজেদের বারে বল ঢুকতে দেয়নি একবারও।

ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানি, মেক্সিকো, আয়ারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল এবং অস্ট্রিয়াসহ বাঘা বাঘা সতেরোটি দল (ডেনমার্ক খেলেছিলো দু'বার) ব্যর্থ হয় সোভিয়েত গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে।

গোলময়

প্রথম শ্রেণীর একটি খেলায় ৩৬টি গোল! তা-ও আবার একই দলের দেয়া। একেবারে অবিশ্বাস্য, তাই না? কিন্তু ১৮৮৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর স্কটিশ কাপ টুর্নামেন্টে এক খেলায় 'অ্যাবরোথ' দল 'বো অ্যাকর্দ' দলকে নিজের মাঠে পরাজিত করে ৩৬-০ গোলে! তবে গোলের পেছনে জাল না থাকায় খেলাটি পুরো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। হলে গোলের সংখ্যা আরো কতো বাড়তো, বলা কঠিন।

আর আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটি দলের পক্ষে গোলের রেকর্ড ১৭-টি। ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন সিডনীতে অনুষ্ঠিত এক খেলায়

ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে ১৭-০ গোলে হারিয়ে দেয় !

চিরতরুণ

একজন খেলোয়াড় পাঁচটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে—এটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। কিন্তু এই বিরল এবং অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী মেক্সিকোর আন্তোনিও কারবাথাল। তিনি ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টগুলোয় অংশ গ্রহণ করেন।

অন্যরকম হ্যাট্রিক

অলিম্পিক ফুটবলে যুগোস্লাভিয়া পরপর তিনবার দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলো (১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬), হল্যাণ্ড তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলো পরপর তিনবার (১৯০৮, ১৯১২, ১৯২০। (১৯১৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি।)।

সহস্রাধিক

ব্রাজিলের আরতুর ফ্রীদেনরীখ প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলেছেন ৪৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি ১৩২৯ টি গোল করেছেন বলে জানা যায়। ১৯৫৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ২রা অক্টোবর পর্যন্ত ১২৫৪ টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে ১২১৬টি গোল করেছেন ফুটবলের কালো মানিক পেলে। অস্ট্রিয়ার ফ্রানত্স্ বিগার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ৭৫৬টি ম্যাচ খেলে গোল করেন ১০০৬টি।

একক কৃতিত্বে ভাস্বর

১৯৪১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর এক খেলায় স্টেফান স্ট্যানিস 'রেসিং ক্লাব দ্য লেন্স' দলের পক্ষে ১৬টি গোল করেন 'অব্রি-অ্যাসটুরিস' দলের বিরুদ্ধে। স্ট্যানিসের আসল নাম 'স্তানিকোভ্স্কি'। জন্ম পোল্যাণ্ডে।

দ্রুততম গোল

ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী মাইকেল ডোবিন ব্যক্তিগত জীবনে একজন পরিসংখ্যানবিদ। অফিসিয়াল ম্যাচগুলোর দ্রুততম গোলের একটি খতিয়ান তাঁর আছে। ১৯৮১ সালে 'কুইন্স্ পার্ক' এবং 'বোল্টন' দলের মধ্যেকার খেলায় টমি লেংগ্লি গোল করেন খেলা শুরু হবার ছয় সেকেণ্ড পরে। 'ব্রেডফোর্ড সিটি' দলের জিম ফ্রেইড ১৯৬৪ সালে গোল করেছিলেন চতুর্থ সেকেণ্ড। আর ব্রাজিলের বিখ্যাত খেলোয়াড় রিভেলিনো একবার খেলা শুরু হবার পর গোল করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র তিন সেকেণ্ড।

ঢাকা মোহামেডানের এমেকা সম্প্রতি খেলা শুরু হবার পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে গোল করেছেন। তবে বলে রাখা উচিত, রেফারীর খামখেয়ালীপনার দরুণ বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক প্রস্তুত হবার আগেই খেলাটি শুরু হয়।

আত্মপ্রেম

১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের খেলাগুলোয় আত্ম-ঘাতী গোল হয়েছিলো সর্বমোট দু'টি। গোলদাতা দু'জনেই ছিলো

বুলগেরিয়া দলের—ভুত্‌সভ এবং দাভিদভ। দুঃখের ব্যাপার ছিলো এই যে, তিনটি খেলায় অংশ নিয়ে বুলগেরিয়া প্রতিপক্ষ দলকে গোল দিতে পেরেছে মাত্র একটি। অথচ নিজেদের বারে বল ঢুকিয়েছে দু'বার!

হায় গুরু!

বিশ্বকাপ ফুটবলে পেনাল্টি কিক থেকে প্রথম গোল করতে ব্যর্থ হন ব্রাজিলের ব্রিটো। বলা বাহুল্য, ব্রিটোকে বলা হতো পেলের গুরু।

অত্যুৎকণ্ঠা

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি খেলায় মর্মান্তিক একটি ঘটনা ঘটে। স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের মধ্যেকার খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলো ১-১ গোলে। এর ফলে স্কটল্যাণ্ডের মেক্সিকো যাবার পথ সুগম হলো অনেকখানি।

কিন্তু দলের ৬০ বছর বয়স্ক প্রবীণ কোচ জ্যাক স্টেইন এতো বেশি টেনশনে ভুগছিলেন যে, খেলা শেষ হবার সাথে সাথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

তস্করপঞ্চক

বিশ্বকাপের প্রথম ৪০ বছর নাম ছিলো জুলে রীমে ট্রফি। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপের সময় নিয়ম করা হয়, যে-দল তিন-বার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হবে, জুলে রীমে ট্রফিটি তাদের হয়ে

যাবে চিরদিনের জন্যে।

১৯৭০ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের জন্যে বিশ্বকাপ বিজয়ী হলো ব্রাজিল। বিপুল অভিনন্দন এবং জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্যে তারা বিশ্বকাপের মূল ট্রফিটি নিয়ে গেল ব্রাজিলে। এক ফুট উঁচু, নয় পাউণ্ড ওজনের সোনার কাপটি ব্রাজিলের হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

কিন্তু ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে রিও থেকে চুরি হয়ে গেল জুলে রীমে ট্রফিটি। পাঁচজন দস্যুর একটি দল ট্রফিটি গলিয়ে সোনা বিক্রি করলো ১৮ হাজার পাউণ্ডে!

নিবিড় ফুটবল চাষ

সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে ফুটবল দলের সংখ্যা ৯০ হাজার। 'লেদার বল' নামের একটি টুর্নামেন্টে সেখানে অংশ নেয় প্রায় ৩০ লাখ বালক!

ফুটবলরঙ্গ

ঈগল পাখি পাছে ধরে

খেলা চলছিলো বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজে। মাঠের ওপরে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ঈগল। কেউ অবাক হলো না এতে। এটা তো নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। আর কে না জানে, লাপাজ শহরটি অবস্থিত সমুদ্র-সমতলের অনেক ওপরে। বলা যায়, ঈগলের রাজত্ব সেখানে।

হঠাৎ শাঁ করে নিচে নেমে এলো একটা ঈগল। দু'পায়ের নখরে বলটা খামচে ধরে উড়াল দিলো আকাশে। বিস্ময়ের সীমা রইলো না খেলোয়াড় এবং দর্শকদের। নতুন বল দিয়ে খেলা পরিচালনা শুরু করলেন রেফারী। পুনরাবৃত্তি হলো একই ঘটনার—আরেকটি ঈগল নেমে এসে নতুন বলটি নিজের আয়ত্তে নিয়ে উড়ে গেল নাগা-লের বাইরে। খেলা স্থগিত রাখতে হলো।

রমণী ভয়ংকর

প্রমীলা ফুটবলও যে কতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো ১৯৮৩ সালে। ব্রাজিলে প্রমীলা ফুটবল লীগের খেলা চলছিলো 'বানগু' এবং 'রাদার' দলের মধ্যে। খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে শুরু হলো গণ্ডগোল। ভিডিও রেকর্ডারে ধারণকৃত এই সময়ের দৃশ্য মহিলা ফুটবলারদের যুদ্ধংদেহী মনো-ভাবের সাক্ষ্য দিলো।

দেখা গেল, ক্ষুব্ধ মহিলা ফুটবলারেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে রেফারীর ওপরে (বিপরীত লিঙ্গের প্রতিনিধি ছিলো বেচারা রেফারী), সে

দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে কোনোমতে, আর তার পিছু ধাওয়া করে তেড়ে আসছে রণরঙ্গিনীরা।

দিশেহারা নাবিক

ব্রাজিলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় পিনেইরো গোল করার অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে অনন্য একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এক মৌসুমে তিনি গোল করেন দশটি। বলা বাহুল্য, সবগুলো গোলই আত্মঘাতী। পরের মৌসুমে তাঁকে নামানো হলো স্ট্রাইকার হিসেবে। প্রথম খেলাতেই গোল করে বসলেন পিনেইরো। এবং আবারও আত্মঘাতী।

তাঁর পঁচিশতম জন্মদিনে সতীর্থ খেলোয়াড়েরা উপহার হিসেবে নিয়ে এলো একটি কম্পাস। সেটার গায়ে খোদাই করে লেখা: 'মনে রেখো, বিপক্ষ দল অপর প্রান্তে।'

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগের একটি খেলায় রেফারীকে ঘুষি মারার অপরাধে একজন খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন রেফারী। ঘটনাক্রমে রেফারীর নাম ছিলো সিজার এবং খেলোয়াড়ের—ব্রুটাস।

মাথার 'পরে বল

একটি ফুটবল কতোটা সময় হাতের সাহায্য ছাড়া মাথার ওপরে ধরে রাখা সম্ভব? ফ্রান্সের মার্সেল ফেরেরি এ-ব্যাপারে একটি অভি-

নব বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। মাথার 'ওপরে বল রেখেছিলেন তিনি পাকা সাড়ে চার ঘণ্টা!

স্বরূপ উদ্ঘাটন

মেক্সিকো বিশ্বকাপের সপ্তাহকয়েক আগে ফিফা কর্মকর্তা এবং বিশ্বকাপ অর্গানাইজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। খেলাটি পর্যবসিত হয় কুৎসিত বচসা এবং অশোভন ঝগড়ায়। উভয় দলই খেলাটিকে এতো গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছিলো যে, দু'দলের দু'জন খেলোয়াড়কে রেফারী লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন মাঠ থেকে।

বিশ্বকাপ এবং হাঙ্গেরির তৃতীয় মিনিট

বিশ্বকাপের প্রাথমিক বা চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় হাঙ্গেরি সর্বমোট তিনবার তৃতীয় মিনিটে গোল খেয়েছে এবং প্রতিবারই গোলদাতা দল ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৬ সালে হাঙ্গেরির জন্যে দুঃখজনক এই কাকতালীয় ঘটনাগুলো ঘটে।

উৎসবাতঙ্ক

মেক্সিকো বিশ্বকাপে স্বাগতিক দেশের প্রতিটি বিজয়ের পর আনন্দোৎসবের প্রাবল্য এতোটা তীব্র এবং অকল্পনীয় ছিলো যে, ব্রাজিলের কালো মানিক পেলে পর্যন্ত রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। 'উৎসবের মাতম এ-হারে চলতে থাকলে,' তিনি বলেন, 'আমার মতো সব বিদেশীকেই মেক্সিকো ছেড়ে পালাতে হবে।'

চোর পালালে···

হাঙ্গেরি প্রথম খেলাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে অসহায়ভাবে হেরে গেল ০-৬ গোলে। খেলার ফলাফল হতে পারতো ১০-০। হাঙ্গেরির কোচ তো রেগে আগুন! সব ফুটবলারকে পাঁচঘণ্টা বন্দী করে রাখলেন একটি ঘরে, ভিডিও-তে বারবার দেখালেন হাঙ্গেরি-সোভিয়েত ইউনিয়ন ম্যাচটি, বোঝালেন ভুলে এতো লজ্জাজনক ভাবে হারতে হলো তাদের। ঘটনাটি মেক্সিকো বিশ্বকাপের।

পঞ্চদশ ভ্রাতা

একই পরিবারের দুই-তিন ভাই একই দলে ফুটবল খেলে, এটা হর-দমই দেখা যায়। কিন্তু একটা ফুটবল দলের এগারোজন এবং অতি-রিক্ত চারজন—সর্বমোট পনেরোজন খেলোয়াড়ই সহোদর ভাই —এটা অবাস্তব মনে হয়।

কিন্তু ঘটনাটি সত্য। আর্জেন্টিনার লাভাল গ্রামের সেই ফুটবল দলটির নাম—'পনেরো ভাইয়ের দল'। উল্লেখযোগ্য যে, দলটিতে খেলে থাকে তিন জোড়া যমজ ভাই।

নেই কাজ তো···

ঘটনাটা ঘটেছিল সুইডেনে ১৯৮০ সালের মে মাসের ৮ তারিখে। ২০ বছর বয়স্ক ফুটবলার এম পাম্‌কভিস্ত সেদিন গড়েছিলেন স্বাতন্ত্র্য-সূচক এক বিশ্বরেকর্ড। পাকা দশ ঘণ্টা বলকে মাটিতে পড়তে দেননি তিনি—সারাক্ষণ পা এবং মাথা দিয়ে আঘাত করে শূন্যে রেখে-

ছেন। এই দীর্ঘ সময়ে বলকে তিনি আঘাত করেছিলেন সর্বমোট ৮০,৩৫৭ বার।

অপরা ছবি

খেলার সময় নয়, খেলা শুরু হবার আগেই বিচিত্র এক উপায়ে আহত হয়েছিলেন 'মনাকো' দলের গুরতেন।

খেলার আগে জনৈক ফটোগ্রাফারের অনুরোধে 'মনাকো' দলকে পোজ দিতে হয়েছিলো। গুরতেন বসেছিলেন সামনের সারিতে। বেমক্কা বসতে গিয়ে হাঁটু মচকে গিয়েছিলো তাঁর। তাই তিনি অংশ-গ্রহণ করতে পারলেন না সেদিনের খেলায়।

আনন্দ-বেদনার ফুটবল

১৯৮৬-র বিশ্বকাপে স্বাগতিক দেশ মেক্সিকো দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় উন্নীত হলে মেক্সিকোবাসী মেতে ওঠে আনন্দযজ্ঞে। কিন্তু আনন্দ-উল্লাস একসময় দাঙ্গার রূপ নেয়। ফলে আহত হয় পঞ্চাশজন এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করে ছ'শোজনকে। গোটা মেক্সিকো সিটিতে ডাকাতি হয় দেড়শোরও বেশি।

বাঘ-সিংহ এবং ফুটবলার

আর্জেন্টিনার অন্যতম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রেফারীর নাম দন ভেরনাত্‌স্‌। মাঠে যতক্ষণ তাঁর উপস্থিতি, বেয়াড়া ও উদ্ধত সব খেলোয়াড় ঠাণ্ডা। ভুলেও কেউ অসদাচরণ করবার দুঃসাহস পায় না। ঠাণ্ডা এমনকি সমর্থকেরাও। দলের কোনো সিদ্ধান্তেই সশব্দ প্রতিবাদ করে না কেউ। তাঁকে এতো ভয় পাবার কারণ কী?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রেফারী হবার আগে দন সার্কাস দলে কাজ করতেন। খেলা দেখাতেন বাঘ আর সিংহের খাঁচায় ঢুকে।

ফুটবলারদের সঙ্গীতপ্রতিভা

১৯৮৬ সালের ক্রিসমাসে ইতালির মিউজিক্যাল হিট-প্যারেডে জায়গা করে নিলো একটি রেকর্ড। ফুটবলপ্রিয় দর্শকরা খুব কিনতে লাগলো রেকর্ডটি। কী ব্যাপার?

জানা গেল, রেকর্ডের গানগুলো গেয়েছেন ইতালিতে খেলতে আসা ভিনদেশী ফুটবল তারকারা—ফ্রান্সের প্লাটিনি, পশ্চিম জার্মানির রুমেনিগে, ডেনমার্কের এলকেয়ার, লড্রুপ, বারগ্রেন, আয়ার-

ল্যাণ্ডের ব্রেইডি, ব্রাজিলের জুনিয়র এবং সুইডেনের করনেলিউসন। সঙ্গীত সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন যে, ফুটবলাররা গানগুলো নেহাত খারাপ গাননি।

রেকর্ডটির বিক্রয়লব্ধ টাকা জমা দেয়া হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের শিশু-দের সাহায্য-তহবিলে।

আঙুর ফল মিষ্টি

১৯৮৩ সালে ভারতের নেহেরু কাপ টুর্নামেন্টে অংশ নেবার জন্যে কোচিন শহরে এসেছিলো ক্যামেরুন ফুটবল দল। প্রতিদিনের প্র্যাক-টিস ম্যাচের পরে তারা গাড়ি নিয়ে যেতো স্থানীয় বাজারে। উদ্দেশ্য, আঙুর ফল কেনা।

স্থানীয় বাজারে আঙুরের মূল্য ভীষণ বিস্মিত করেছিলো তাদের। মাত্র ৬ রুপী দিয়ে এক কেজি আঙুর! এ তো স্বপ্নের ব্যাপার! আর তাদের দেশে আঙুর আমদানী করা হয় ফ্রান্স থেকে এবং দাম পড়ে প্রতি কেজি ৩৫ রুপী!

হেডমাস্টার

ফুটবলে উদ্ভট রেকর্ডের কি অন্ত আছে! বুলগেরিয়ার রাদোস্লাভ নিকোলভ অসংখ্য দর্শকের সামনে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পথ অতি-ক্রম করেন ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট সময়ে। তাঁর সঙ্গে ছিলো একটি ফুটবল। বলটিকে তিনি সারাক্ষণ 'হেড' করে এগিয়ে যেতে থাকেন। এই দীর্ঘ পথে বলটিকে তিনি মাটিতে পড়তে দেনইনি, এমনকি মাথা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ দিয়ে স্পর্শও করেননি। প্রায় ১৮

কিলোমিটার পথে বলটিকে তিনি 'হেড' করেন ১৮১১০ বার।

ময়দানে রাজনীতির গুণ্ডা ?

গুণ্ডা মনোবৃত্তির ছেলেদের ইংল্যাণ্ডের বয়স্ক লোকেরা ডাকেন 'ইয়ব' (YOB) বলে। এই শব্দটি এসেছে ইংরেজি BOY শব্দটি উল্টে দিয়ে।

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল ময়দানের গুণ্ডারা জগদ্বিখ্যাত। অনেকের ধারণা, এই 'ইয়ব'দের কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে। কারণ, গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সময় 'ইয়ব'-রা প্রায়ই শ্লোগান দিয়েছে, 'আমরা জার্মানি আক্রমণ করবো, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করবো।'

বাংলা ক্যাপিট্যাল লেটার

১৯৮১ সালের এশিয়ান গেমসের ফুটবলের প্রস্তুতির সময় ভারতীয় দলের ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে রাতে ২১ জন খেলোয়াড় পালিয়ে গিয়েছিলো। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলো বাংলা পত্র-পত্রিকায়। পরে পালিয়ে-যাওয়া একজন খেলোয়াড় মন্তব্য করেছিলেন, 'আর কতো লিখবে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে, তা-ও আবার ক্যাপিট্যাল লেটারে ?'

বাংলা ভাষায় ক্যাপিট্যাল লেটার নেই, তবু ক্যাপিট্যাল লেটার বলতে খেলোয়াড়টি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন পত্রিকার বড়ো বড়ো হেডিংগুলোকে।

ফুটবল-সিম্ফনি

মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হবার আগে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত সঙ্গীতকার এডি ওয়ার্নার একটি সুর রচনা করেন। সেটার নাম তিনি

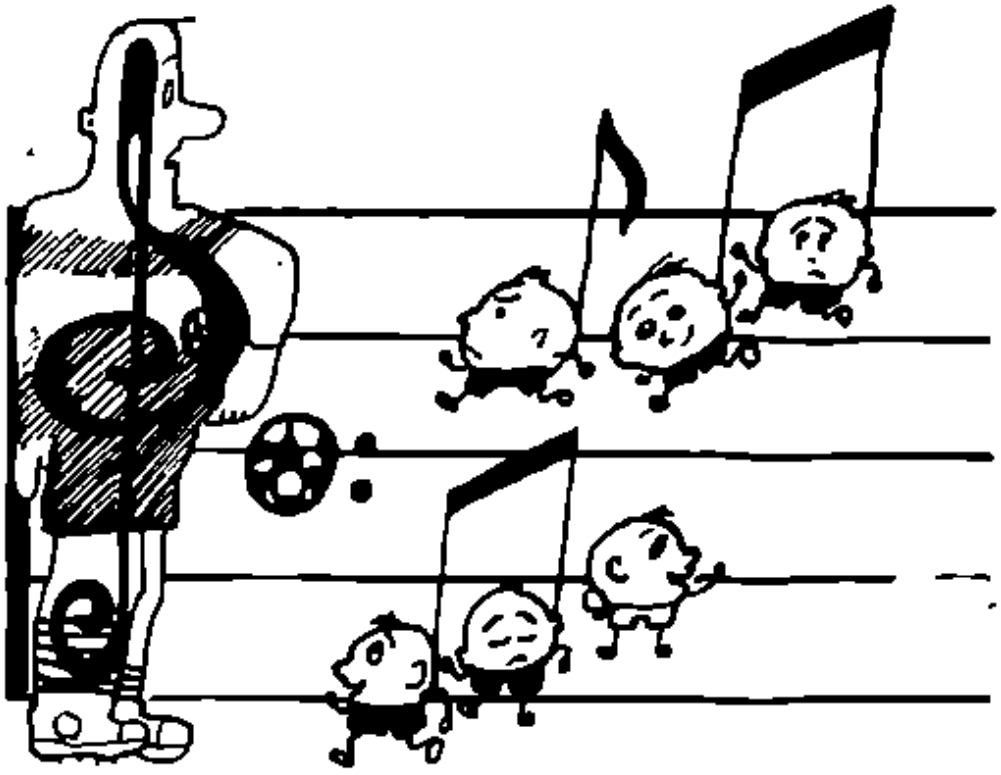

দিয়েছিলেন 'ফুটবল'। সাবটাইটেলে লেখা ছিলো—'বারো গোল এবং দু'টি পেনাল্টি শটে সিম্ফনি' (A Symphony in Twelve Goals and Two Penalty Shots)।

শুধুই শোভা?

টেনিস এবং হকি খেলোয়াড়েরা সচরাচর রিস্টব্যাণ্ড পরে থাকেন। তবে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপে অনেক ফুটবলারের এক হাতে রিস্টব্যাণ্ড লক্ষ্য করা গেছে। ইংল্যাণ্ডের স্ট্রাইকার ক্রিস ওয়্যাড্‌ল আরো এক

ধাপ ওপরে ! দু'হাতেই রিস্টব্যাণ্ড পরেছেন তিনি। তবে বেলজিয়াম-স্পেনের কোয়ার্টার ফাইনালের রেফারী পূর্ব জার্মানির সীগফ্রীড কিরশেন টেক্কা দিয়েছেন সবাইকে। পোশাকের রঙের সাথে ম্যাচ করে তিনি পরেছিলেন কালো রঙের রিস্টব্যাণ্ড।

কেহ নাহি ছাড়ে ঃ

গ্যালারীতে সমর্থকদের মারামারি এবং তাণ্ডবলীলা ঠেকানোর জন্য ইংল্যাণ্ডের কোভেনট্রি শহরের পুলিশ নতুন পদ্ধতি বের করলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, গ্যালারীর বিভিন্ন গোপন জায়গায় রাখা হবে টেলিভিশন ক্যামেরা। এতে করে অপরাধীকে সনাক্ত করা সহজতর হবে।

কিন্তু কথাটা ফাঁস হয়ে যেতেই প্রতিবাদে ফেটে পড়লো সমর্থকেরা। কোনো ফল হলো না তাতে। পুলিশ অটল রইলো তাদের সিদ্ধান্তে। তার মানে সমর্থকরা হেরে যাচ্ছে ? সেটা কী করে হয়? পুলিশী পদ্ধতি অকেজো করে দিতে অব্যর্থ পদক্ষেপ নিলো তারা। অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই শহরের সমস্ত দোকান থেকে কার্নিভালের মুখোশ বিক্রি হয়ে গেল হুড়দাড় করে।

জনক এবং আশ্চর্যজনক গোল

যুগোশ্লাভিয়ার ফুটবলার মিলান ভিদিনিচ ১৯৭০ সাল থেকে খেলতে শুরু করেন ফ্রান্সে। খেলেন তিনি স্টপার পজিশনে। স্বাভাবিক কারণেই গোল করার চিন্তা থাকে না তাঁর মাথায়। ১৯৭২ সালে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো তাঁর জীবনে।

স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। তাই সন্তান জন্মের আগ পর্যন্ত ভীষণ টেন-শনে সময় কাটালেন মিলান। একদিন খেলতে নামার ঠিক আগে খবর এলো : তিনি দুই যমজ পুত্র সন্তানের জনক হয়েছেন। মাঠে নেমে প্রথমবারের মতো বলটি পায়ে পেয়ে তিনি খুশির চোটে এতো জোরে শট করলেন যে, বল সোজা ঢুকে গেল প্রতিপক্ষের গোলবারে। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গোলবার থেকে ৫৫ মিটার দূরে!

স্ট্রেচারথেরাপি

মেক্সিকো বিশ্বকাপে বুলগেরিয়া বনাম মেক্সিকোর খেলার একসময় হুগো সানচেজ আহত হলে স্ট্রেচারে করে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠের বাইরে যাবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিনি স্ট্রেচার থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে নেমে পড়েন এবং ফিরে আসেন মাঠে।

ব্রাজিল-পোল্যাণ্ড খেলায় আহত হয়ে মাঠে গড়াগড়ি দিতে থাকেন ব্রাজিল দলের অধিনায়ক এডিনহো। রেফারীর ইঙ্গিতে স্ট্রেচার মাঠে আনার সাথে সাথেই তিনি উঠে দাঁড়ান।

উপযুক্ত সম্মানী

রেফারীর খেলা পরিচালনার মানে অসন্তুষ্ট প্রকাশের অদ্ভুত একটি উপায় বের করেছিলেন স্পেনের 'এসতাদিলিয়া' দলের কর্মকর্তারা। নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত একটি খেলায় রেফারীর নানান সিদ্ধান্তে নাখোশ হয়ে তাঁরা রেফারীর প্রাপ্য সম্মানী দিয়েছিলেন বস্তায় ভরে। বস্তার ওজন ছিলো ৩৬ কিলোগ্রাম। সম্মানীর পুরো অর্থ-

টাই তাঁরা খুচরো মুদ্রায় বদল করে বস্তায় ভরেছিলেন।

নিজের পারিশ্রমিক ওভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন অপমানিত রেফারী। তাঁর সহকর্মী রেফারীরাও ঘোষণা করলেন যে, 'এসতাদিলিয়া'-র মাঠে আর কোনো খেলা তাঁরা পরিচালনা করবেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনকভাবে রেফারীর প্রাপ্য পরিশোধ করা না হবে।

হার মানতে হলো ক্লাব কর্মকর্তাদের। কিন্তু তাঁরা জানিয়ে দিলেন, পরবর্তীতে ত্রুটিপূর্ণভাবে খেলা পরিচালনা করবেন যে-রেফারী, তাঁকে ঠিক একইভাবে পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হবে। এবং তাঁরা মুদ্রাভর্তি বস্তাটি রেখে দিচ্ছেন সযত্নে।

সেয়ানে সেয়ানে

ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে একটি খেলা পরিচালনার সময় দর্শকরা রেফারী ক্লার্ককে লক্ষ্য করে নানান ধরনের বস্তু ছুঁড়ে মারছিলো। তবু তিনি পুলিশের শরণ নিলেন না। খানিকটা সময় বাদে একটা আপেল এসে পড়লো তাঁর পায়ের সামনে। ক্লার্ক শান্তভাবে আপেলটি তুলে নিয়ে তাতে কামড় দিলেন। ব্যাপারটা খুব পছন্দ হলো দর্শকদের।

এর পর থেকে রেফারীর নেয়া সব সিদ্ধান্ত দর্শকরা খুশি মনে মেনে নিতে লাগলো।

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

আর্জেন্টিনার 'ওহোয়া রেঞ্জার্স' দলের তিনজন বিবাহিত খেলোয়াড়

তিন জোড়া জমজ সন্তানের পিতা হলেন প্রায় একই সাথে। ক্লাবের সদস্যদের পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো—ক্লাবের প্রতীক বদলাতে হবে। কারণ, প্রতীকে চুষনি-মুখে বাচ্চার ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফার্নান্দো মেদেস সাংবাদিকদের বললেন, 'আমরা এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে শক্তিশালী দল না, সেটা আমরা জানি। তবে উৎপাদনশীলতার বিচারে আমরা আমাদের দলের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণ আশাবাদী হতে পারি।'

কাজ এবং কথা

স্পেনের স্ট্রাইকার অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও গোল করতে ব্যর্থ হলেন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। মেক্সিকো বিশ্বকাপের ধারাভাষ্যকার অবলীলায় বলে বসলেন, 'এমনকি আমিও গোল করতে পারতাম ওই জায়গা থেকে।'

প্রবেশ নিষেধ

ঘটনা গড়ালো একেবারে সরকার পর্যন্ত। বেলজিয়াম সরকার সিদ্ধান্ত নিলো, ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাথমিক পর্যায়ের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিতব্য বেলজিয়াম-স্কটল্যাণ্ড খেলায় কোনো স্কচকে স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেয়া হবে না। টিকেটধারী প্রতিটি দর্শককে স্টেডিয়ামের গেটে পুলিশকে তার পাসপোর্ট কিংবা তার জাতীয়তার পরিচয়বাহী কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। বেলজিয়ান সমর্থকেরা স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি পাবে, স্কচরা পাবে না।

কারণ, এর দু'বছর আগে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ডের 'লিভারপুল' ও ইতালির 'জুভেন্টাসের'মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলায় বৃটিশ সমর্থকদের সৃষ্ট গোলযোগের দরুণ স্টেডিয়ামে নিহত হয়েছিলো ৩৯ জন।

বিজাতীয় সঙ্গীত

ইসরাইল ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ফিরতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেলবোর্নে। খেলা শুরু হবার আগে ইসরাইলের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর ঘোষণা শোনা গেল। কিন্তু মাইকে ভেসে এলো পশ্চিম জার্মানির জাতীয় সঙ্গীতের সুর।

অনেকক্ষণ বাজার পরে টনক নড়লো কর্তৃপক্ষের। বাজনা থামিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, একজন টেকনিশিয়ানের ভুলের কারণে এই অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটেছে।

পাতলা-মোটার ফুটবল

জার্মানির মাগ্‌ডেবুর্গ শহরে স্থানীয় একটি উৎসবের সময় ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে একটি মজার খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'স্থূলাঙ্গী' দল খেলেছিল 'ক্ষীণাঙ্গী' দলের বিরুদ্ধে। 'স্থূলাঙ্গী' দলের এগারো জন খেলোয়াড়ের সর্বমোট ওজন ছিলো ১·৩ টন। প্রতিপক্ষ 'ক্ষীণাঙ্গী' দলের সবচেয়ে শীর্ণকায় খেলোয়াড়ের ওজন ছিলো ৩৯ কিলোগ্রাম, আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবানের—৫৬ কিলোগ্রাম। খেলার রেফারীও ছিলেন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তাঁর উচ্চতা ছিলো চার ফুট সাত ইঞ্চি। লাইন্সম্যান দু'জনের সর্বমোট উচ্চতা ছিলো

তেরো ফুটেরও বেশি।

উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলাটি ৩-৩ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল।

অসম্পূর্ণ

ব্রাজিলের কাস্ত্রো দ্য সিলভা কাবিনিয়ো পেশাদার ফুটবল খেলেছেন ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত। শেষ ১১ বছরে তিনি মেক্সিকোর ফুটবল লীগে খেলে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেন ৬ বার। মেক্সিকোয় খেলতে আসার আগে ব্রাজিল লীগে দু'বার এই গৌরব জোটে তাঁর কপালে। একবার তো খোদ ব্রাজিলে এক মৌসুমে গোল করেছিলেন ৪৬টি! জীবনের সর্বশেষ লীগে ২৩টি গোল করে অষ্টমবারের মতো শ্রেষ্ঠ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেন তিনি।

ব্রাজিলের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে—গোল করার ব্যাপারে অবিশ্বাস্যরকম দক্ষ ছিলেন কাবিনিয়ো, কিন্তু নিজেকে একজন পরিপূর্ণ ফুটবলার হিসেবে প্রমাণ করতে তিনি ব্যর্থ হন। ফলে, একজন 'গোলমেশিন' হয়েও ব্রাজিল জাতীয় দলে খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর।

যোধোদ্ধর

১৯৮২-র বিশ্বকাপে সবচেয়ে আনস্পোর্টিং খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত পশ্চিম জার্মানির গোলরক্ষক শুমাখের ১৯৮৬-তে ছিলেন সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ। স্বাগতিক দেশ মেক্সিকোর বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার শেষের দিকে মেক্সিকোর ফুট-

বল-তারকা হুগো সানচেজ মাংসপেশীর যন্ত্রণায় জার্মান পেনাল্টি সীমানার কাছে শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন। নিজের জায়গা ছেড়ে শুমাখের এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। খেলা কিন্তু থেমে নেই। শুমাখের ভ্রূক্ষেপ করলেন না সেদিকে, বরং হুগোর পা ম্যাসেজ করলেন তিন-চার মিনিট ধরে।

দাতা গোলদাতা

মেক্সিকোর বিশ্বকাপের খেলায় পর্তুগীজ দল ইংল্যাণ্ড দলকে হারিয়ে দেয় কার্লোস ম্যানুয়েলের গোলে। ম্যাচ জেতার কারণে পর্তুগীজ দলের প্রতিটি খেলোয়াড় ৭০০ ডলার করে পুরস্কার পান। গোল-দাতা কার্লোস পুরস্কারের সমস্ত অর্থ দান করেন অনাথ আশ্রমে।

নির্বাচন পদ্ধতি

আমেরিকার 'কসমস' ফুটবল দলের রক্ষণভাগের প্রাক্তন খেলোয়াড় ভেরনের রোট ব্রুকলিনের এক কলেজে শরীরচর্চার শিক্ষকের কাজ করতেন। ছাত্রদের ফুটবল দল গঠনের সময় অভিনব নির্বাচন পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন তিনি।

'আমি উৎসাহী ছাত্রদের পার্কে নিয়ে যাই,' নিজের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন রোট। 'তারপর সাধ্যমতো গতিতে দৌড়ুতে নির্দেশ দিই তাদের। যারা গাছ-পালা এড়িয়ে নির্বিঘ্নে দৌড়ুতে পারে, তাদেরকে নিয়ে নিই "সকার" (ফুটবলকে আমেরিকানরা এ-নামেই ডেকে থাকে) দলে। আর যারা গাছের সাথে ধাক্কা খায় দুম্‌দাম, তাদের নিয়ে "আমেরিকান ফুটবল" দল বানাই।'

ইস্টিশানের রেলগাড়িটা

ট্রেন সেই যে এসে থামলো এক স্টেশনে, আর নড়ার নামটি নেই। গোটা ট্রেনের লোকজন হুমকি দিচ্ছে, শাসাচ্ছে ট্রেনচালককে। তাঁর বিকার নেই কোনো। তিনি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে নিবিষ্টমনে টেলিভিশনে ফুটবল দেখছেন। খেলার শেষ বাঁশি বেজে উঠলে পর ট্রেন চলতে শুরু করলো।

ঘটনাটি ঘটেছিলো পেরুতে। ছোট্ট এক স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিলো ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বলা বাহুল্য, শৃংখলা ভঙ্গের কারণে বড়ো অংকের একটা জরিমানা দিতে হয়েছিলো ট্রেনচালককে।

অভিমান

স্পেনের 'রিয়াল মাদ্রিদ' এবং 'সেভিলিয়া' দলের খেলাটি ২-২ গোলে শেষ হলে 'সেভিলিয়ার' কর্মকর্তারা রেফারীর খেলা পরিচালনা পক্ষপাতদুষ্ট মনে করে একটি বিবৃতি দেন। তাঁদের ধারণা, রেফারী 'রিয়াল মাদ্রিদের' কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছে।

পরে রেফারী পল গারিসা ডে লোসা দুঃখ করে বলেন, 'ওরা খামোকা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছে। আমার রেফারীং ছিলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আর তাছাড়া, ওরা কি জানে না যে আমিই স্পেনের সেরা রেফারী?'

বিনি পয়সার বিজ্ঞাপন

স্পেনের পত্রিকা 'এস' জানিয়েছে, বিজ্ঞাপনের জন্যে 'রিয়াল মাদ্রিদ' দল প্রতি বছর তাদের নিজস্ব বাজেটে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ

করে থাকে। তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সবচেয়ে সফল বিজ্ঞাপন ছিলো মেক্সিকোর বিশ্বকাপে 'রিয়াল মাদ্রিদের' খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত ক্রীড়ানৈপুণ্য। স্পেনের বুতরাগেনিয়ো, মেক্সিকোর সানচেজ এবং আর্জেন্টিনার ভালদানো—তিনজনেই 'রিয়াল মাদ্রিদের' খেলোয়াড় এবং এই তিনজনে বিশ্বকাপে গোল করেছে মোট ১০টি—বুতরাগেনিয়ো ৫টি, ভালদানো ৪টি এবং সানচেস ১টি।

ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দলের পক্ষে 'ডিনামো কিয়েভের' ফুটবলারেরা গোল করেছে সর্বমোট ৯টি।

ফুটবল-জ্যোতিষী

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ১৩টি খেলায় বিজয়ী দলগুলোর নাম কিংবা কোন খেলাটি ড্র হবে, সেটা আগাম বলা খুবই দুরূহ কাজ, সন্দেহ নেই। ইতালিতে সঠিক ভবিষ্যৎবক্তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে দু'জন ১৩টি খেলার সঠিক ফলাফল আন্দাজ করতে পেরেছিলো। তাদের প্রত্যেকে পেয়েছিলো ২৩ লাখ ডলার। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে খবর পাওয়া গেল, এবারে সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে তিনজন। এটি একটি রেকর্ড। এই ফুটবল-জ্যোতিষীদের প্রত্যেকে পেয়েছে ৩০ লাখ ডলার।

সভ্যতার পরাকাষ্ঠা

ইংল্যাণ্ডের সমর্থকদের দুর্নাম এমনিতেই গোটা দুনিয়া জুড়ে। তাদের দুর্নামের যৌক্তিকতার আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে মেক্সিকোর

বিশ্বকাপে। তাদের হৈ-হুল্লোড় মেক্সিকোর পুলিশ, সাধারণ লোক-জন এবং অন্যান্য দলের সমর্থকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো। এক শহরের পুলিশ প্রধান ইংল্যাণ্ডের সমর্থকদের 'পশুতুল্য' আখ্যা দিয়েছেন। না দেবার কারণও তো নেই। তারা আধা-উলঙ্গ কিংবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেরিয়েছে এখানে-সেখানে, মলমূত্র ত্যাগ করেছে যত্রতত্র, হোটেলে খেয়ে বিল না মিটিয়েই উঠে পড়েছে।

বেয়াড়া বাসনা

৩৫ ঘন্টা ১ মিনিট খেলা চললো অবিরাম, গোল হলো ২৬৫টি। ঘটনাটি ঘটেছিলো ফ্রান্সে। খেলেছিল দু'টি সৌখিন দল।

'খুব বাজে হয়েগেছে ব্যাপারটা,' খেলা শেষে বিজয়ী দলের গোল-রক্ষক জাক ভেনক্র বলেছিলেন। 'আমাদের এখন একবিন্দু নড়বার ক্ষমতা নেই। শারীরিক অথবা মানসিক কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই আর।' এই দু'টি দলের আসল উদ্দেশ্য ছিলো অবিরাম খেলায় পুরনো বিশ্বরেকর্ড ভাঙা। ৬৫ ঘন্টা ১ মিনিট খেলে বিশ্বরেকর্ডটি স্থাপন করেছিলো আয়ারল্যাণ্ডের দু'টি দল।

তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আয়ারল্যাণ্ডের দল দু'টি খেলেছিলো ইনডোরে, অনেক ছোট মাঠে। আর ফরাসীরা খেলে-ছিলো প্রচলিত মাপের উন্মুক্ত মাঠে।

লাগসই আইন

ইংল্যাণ্ডের একটি সৌখিন ফুটবল দলের গোলরক্ষক ফিল আর্মস্ট্রংকে

রেফারী হলুদ কার্ড তো দেখাবেনই, উপরন্তু ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক লাভ করলো বিপক্ষ দল। খেলা শেষ হলে রেফারী ব্যাপারটি সবাই-কে এভাবে বিশ্লেষণ করলেন, 'খেলা চলাকালীন আমি হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আর্মস্ট্রং-এর মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সাথে সাথে খেলা থামিয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সিগারেটটি কেড়ে নিয়ে তাকে হলুদ কার্ড দেখাই। কিন্তু আর্মস্ট্রং আমার সাথে তর্ক শুরু করে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, ফুট-বল মাঠে ফুটবলারদের ধূমপান নিষিদ্ধ বলে কোনো আইন কোথাও লেখা নেই। উত্তরে আমি তাকে বলি, মাঠে ধূমপানের অনুমতি আছে, এমন কথাও তো কোথাও লেখা নেই। অতএব, আমি এখন যা বলবো, সেটাই আইন এবং সেটাই তোমাকে মানতে হবে।'

আক্রোশ

ঘটনাটি ঘটেছিলো ফ্রান্সে, ১১৯৭ সালে। 'বেতুন' ক্লাবের প্যাট্রিস বার্গ খেলা শুরু হবার আগে লক্ষ্য করলেন, বিপক্ষ দলের গোল-বারের ঠিক পেছনে চক্‌চকে প্লাস্টিকের তৈরি সাইনবোর্ডে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। রেফারীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে তিনি বললেন যে, প্রতিফলিত এই উজ্জ্বল আলো খেলায় অসুবিধে সৃষ্টি করবে। রেফারী আমল দিলেন না প্যাট্রিসের কথায়, অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না।'

খেলা শুরু হবার পর প্রথমবার বল পেয়ে ক্রোধান্ধ প্যাট্রিস বার্গ মাঝমাঠ থেকে প্রচণ্ড শট নিলেন সেই সাইনবোর্ড লক্ষ্য করে। শটে এতো জোর ছিলো যে, হতভম্ব গোলরক্ষক দেখলো, বলটি

জড়িয়ে আছে নেটে। খেলায় 'বেতুন' জিতলো ১-০ গোলে।

কাকতালীয়

১৯৮২ সালে স্পেন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ইতালির পাওলো রোসি এবং ১৯৮৬-তে মেক্সিকো বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ইংল্যাণ্ডের গ্যারি লিনেকারের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। রোসি এবং লিনেকার উভয়েই গোল করেন ৬টি। দু'জনের ৬টি গোলই আসে শেষ তিনটি ম্যাচ থেকে। দু'জনেই প্রথম খেলায় করেন ৩টি গোল, দ্বিতীয় খেলায় ২টি এবং তৃতীয় খেলায় ১টি। তবে দু'জনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হলো, রোসি ইতালিকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, লিনেকার সেটা পারেননি।

প্রশিক্ষণ ও সঙ্গীত

১৯৭৩ সালে স্পেনের 'আলেকো' দলের যুগোশ্লাভ প্রশিক্ষক মিলোর্দ পাভিচ সঙ্গীতের তালে তালে প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। এতে করে শরীরের ওপর খাটুনি কম পড়ে বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু এই পদ্ধতি খেলায় কোনো সুফল না আনায় মিলোর্দ পাভিচের স্থলাভিষিক্ত হলেন নতুন প্রশিক্ষক।

অভিনব বিজ্ঞাপন

ব্রাজিলের 'আল্‌টিমা অরা' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিলো—'খেলার মাঠ হইতে নিরাপদে সুস্থ শরীরে বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে একটি শক্ত লোহার বর্ম ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগা-

যোগ করুন : রেফারী সানতেইরা।'

ন'টার সংবাদ ক'টায়

কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা গড়ালো অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। তবু ফলাফল হলো না। অতএব টাইব্রেকার।

ঘটনাটা মেক্সিকো বিশ্বকাপের। ইংল্যাণ্ডে তখন রাত নটা। টেলিভিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'নটার সংবাদ' প্রচারের সময় হয়ে গেছে। দর্শকরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন। খেলার এ-রকম মুহূর্তে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলে কী হবে? কিন্তু বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন টিভি কর্তৃপক্ষ। তাঁরা বুঝলেন, 'নটার সংবাদ' দু'একদিন নটার পরে প্রচার করলে কোনো মহাভারতই অশুদ্ধ হবে না। অতএব, 'নটার সংবাদ' প্রচারিত হলো রাত পোনে দশটায়।

ফুটবলপ্রেম বনাম স্ত্রীপ্রেম

তুরস্কের একজন ফুটবলপ্রেমিক রাতে বিশ্বকাপের খেলার সরাসরি সম্প্রচার উপভোগ করছিলেন টেলিভিশনের সামনে বসে। তাঁর স্ত্রী একসময় তাঁকে খেলা দেখতে বাধা দিলে তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন স্ত্রীকে। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

আগে জানলে ··

ইংল্যাণ্ডের রজার ড্যান্সি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিষয়টি এরকম : '১৮৮০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোয় ফুটবলের ভূমিকা।' বিশেষজ্ঞদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পত্রিকার মাধ্যমে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি।

সিদ্ধান্তটি তাঁর ভুল ছিলো। তিনদিন পর থেকে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে চিঠি আসতে লাগলো তাঁর ঠিকানায়। 'ব্যাপারটি এখন আমার জন্যে আরো জটিল হয়ে পড়েছে,' বলেছেন রজার ড্যান্সি। 'এতো চিঠি পড়ে দেখা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ আমি ভেবেছিলাম, চিঠির মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপদেশ পেলে খাটুনি ও সময় বাঁচবে আমার। এখন এই পরিমাণ চিঠি শুধু পড়ে দেখতে চাইলেও কতো সময়ের ব্যাপার, ভাবতে পারেন?'

ভুল অভিনয়

যমজ ভাইদের নিয়ে ফুটবলেও বিড়ম্বনার অন্ত নেই।

পশ্চিম জার্মানির দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগের একটি খেলায় ঘটনাটি ঘটেছিল। একটি দলের একজন খেলোয়াড় প্রথমার্ধের শেষে পায়ে আঘাত পেয়ে বাধ্য হলো মাঠ ত্যাগ করতে। বিরতির পর বাঁ পায়ে বিশাল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলতে নামলো খেলোয়াড়টি এবং সেই অবস্থাতেই খেলা চালিয়ে যেতে লাগলো বেশ ভালভাবে। সবই ঠিকঠাকমত চলতো, যদি জয়সূচক গোলটি না আসতো তার পা থেকে। বিপক্ষ দলের কয়েকজন খেলোয়াড় সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলো, খেলোয়াড়টি গোলে কিক নিয়েছে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পায়ে, আর তাছাড়া বিরতির আগে মাঠ ত্যাগ করবার আগে সে খোঁড়াচ্ছিল অন্য পায়ে। রেফারীকে গিয়ে তারা অভিযোগ জানালো।

অনুসন্ধান করতেই বেরিয়ে পড়লো আসল ঘটনা।

বিরতির পর আহত ফুটবলারের জার্সি গায়ে চড়িয়ে খেলতে নেমেছিল তার যমজ ভাই।

চাই না মা গো রাজা হতে

ফুটবলের কিংবদন্তী পেলে নিজের দেশ ব্রাজিলে এখনও ভীষণ জনপ্রিয়। সাধারণ লোকজন তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সম্মান করে।

বছর তিনেক আগে পেলেকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করিয়ে দেবার একটা প্রস্তাব এসেছিলো। তখন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি 'জার্নাল ড তারদে' পত্রিকায় প্রকাশিত ৪৮ বছর বয়স্ক পেলের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, গুরুদায়িত্বকে তিনি ভয় পান না মোটেও।

'লোকে চাইলে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট হতে আমার আপত্তি নেই। দুরূহ দায়িত্ব এবং কঠোর পরিশ্রমকে আমি ভয় পাই না। এখন ব্রাজিলে এইডসের চেয়ে বেশি ভয়াবহ হলো দুর্নীতি। সরকারের নিজের লোকজন যদি ক্যাভিয়ার এবং হুইস্কি খেতে চায়, তা থাক। কিন্তু সাধারণ লোকদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো খাবারের সংস্থান তো অন্তত তারা করবে! বিভিন্ন বয়সের লোকজন পথে-ঘাটে আমাকে থামিয়ে বলে, "তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও না কেন? কেন তুমি প্রেসিডেন্ট হতে চাও না?" আসলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ দুর্নীতির ব্যাপকতায় এতো কলুষিত যে, আমার এতো জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সুস্থভাবে নির্বাচনী

প্রচার চালাতে পারবো বলে আমি মনে করি না।'

গরুখোঁজা

স্কটল্যাণ্ড ফুটবল লীগে 'অ্যাবেরডিন' ও 'কিলমারনক' দলের মধ্যে-কার খেলায় দর্শক সমাগম হয়েছিলো প্রচুর। সময়মতো মাঠে প্রবেশ করলেন রেফারী, তাঁর দুজন সহযোগী এবং উভয় দলের খেলোয়াড়েরা। তবু খেলা শুরু হতে বেশ কয়েক মিনিট দেরি হলো। ব্যাপার কী? টস্ করার সময় তাঁর মুদ্রাটি হারিয়ে ফেলেন রেফারী।

পঁচিশ জোড়া চোখ সম্মিলিতভাবে অনুসন্ধান করে মুদ্রাটি খুঁজে পেলো, কিন্তু তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে।

অদ্বিতীয় গোল

১৯৭৩ সালের ঘটনা। খেলা চলছিল হল্যাণ্ডের 'স্পার্টা' এবং স্পেনের 'বার্সেলোনা' দলের মধ্যে। একসময় 'স্পার্টা' দলের স্টপার গোলকিক করে বল পাঠালো বহু ওপরে। শূন্যেই বলটি লিক হয়ে সব বাতাস বেরিয়ে চুপসে গেল। বিকৃত চেহারার বলটি তারপর গিয়ে পড়লো, অবাক কাণ্ড, একেবারে 'বার্সেলোনার' গোলের ভেতরে।

বল বদলে দেবার নির্দেশ দিলেন রেফারী এবং 'বার্সেলোনার' খেলোয়াড়দের জোর প্রতিবাদের মুখেও জানালেন—গোল হয়েছে।

বৃথা এ সাধনা

শনিবার বিকেলে ফুটবল। স্কটল্যাণ্ডের ফিলিপ মাইকফেইল তাই

শুক্রবার রাতে স্টেডিয়ামে ঢুকে বসে রইলেন। উদ্দেশ্য, পরদিনের ম্যাচটি বিনে পয়সায় দেখা। ভোরের দিকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো তাঁর। এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভেঙে গেল ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে। লাফ দিয়ে উঠে বসলেন ফিলিপ মাইকফেইল—খেলা শুরু হয়ে গেল নাকি? না। তিনি দেখলেন, কিছু লোকজন একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিচ্ছে স্টেডিয়ামের দরজায়। সেই পেরেক ঠোকার শব্দেই ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। চোখ কচলে নোটিশটি পড়ার চেষ্টা করলেন তিনি: 'অদ্য অনুষ্ঠিতব্য ফুটবল ম্যাচটি অনিবার্য কারণবশত আগামীকাল অনুষ্ঠিত হইবে।'

মৌমাছি মৌমাছি

খেলার পঁচাত্তর মিনিট সময় পেরিয়ে গেছে। খেলছে ব্রাজিলের দু'টি দল, 'আতলেতিকো পারানায়জে' এবং 'খানদাইয়া'। রেফারী মোরেইরা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁশি বাজিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন মাটির ওপরে। তাঁর দেখাদেখি হুড়মুড় করে একই ভঙ্গিতে মাটিতে শুয়ে পড়লো সব খেলোয়াড়েরা।

ব্যাপার কী? না, মেঘের মতো ঘন হয়ে মৌমাছির একটি দল নেমে এসেছে স্টেডিয়ামের ওপরে। সেই সময় স্টেডিয়ামের এক কর্মচারী একটি দৈনিক পত্রিকা ধরে ছিলো হাতে। সেটাতে আগুন লাগিয়ে মশাল বানিয়ে স্টেডিয়াময় ছুটে বেড়ালো সে। পালিয়ে গেল মৌমাছিরা। তারপর খেলা শুরু হলো নির্বিঘ্নে।

কেবল একজন খেলোয়াড় আহত হয়েছিলো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার সময় বেমক্কা চোরে পড়ে নাকে আঘাত পান তিনি।

বিসমিল্লায় গলদ

ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯০৪ সালে। ফিফার নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের নোটিশে কোনো দেশই তাদের জাতীয় দল পাঠাতে সম্মত হয়নি। ফলে, প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা মাঠে মারা যায়।

আক্ষেপ ঃ

১৯৮৮ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সময় ইংল্যাণ্ডের ময়দানী গুণ্ডাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো পশ্চিম জার্মানির জনগণ।

সেই সময় 'স্টার্ন' পত্রিকার সাংবাদিকের কাছে স্থানীয় একজন জার্মান গুণ্ডা দুঃখ ও আক্ষেপমিশ্রিত স্বরে বলেছিলো, 'সংখ্যায় ইংল্যাণ্ডের গুণ্ডারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সাহসের দিক দিয়েও পিছিয়ে আছি আমরা। ওরা ভয়ানক সাহসী এবং নির্দয়। আমাদের ছেলেদের দিল আবার বেশ নরম। ছুরি ধরলে ওদের বুক কাঁপে। আসলে বুঝলেন, এদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না। ওদের সামনে এরা একেবারেই অচল।'

পাড়াপ্রীতি

ভারতের মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ১৯৮২ সালে ভারতীয়

দলের প্র্যাকটিস চলছিলো নেহেরু কাপের আগে। ফ্রী কিক, পেনাল্টি কিক, দূরপাল্লার জোরালো শট ইত্যাদির ট্রেনিং চলছিলো। জাতীয় দলে স্থান পাওয়া স্থানীয় একজন ফুটবলার বার বার 'দুর্দান্ত' কিকে বল পাঠিয়ে দিতে লাগলেন পেছনের হাইকোর্ট মাঠে। কীর্তিটি তিনি করলেন সাতবার। কোনোবারই বল ফেরত এলো না। না আসারই কথা। পরে জানা গেছে, ফুটবলারটি পাড়ার ক্লাবের চারজন ছোকরাকে আগে থেকেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন হাইকোর্ট মাঠে। তারা প্রস্তুত ছিলো বস্তা সাথে নিয়ে। একটা করে বল উড়ে আসে, আর তারা সেটা পুরে রাখে বস্তায়। এভাবে সাতটি বল বস্তায় ভরে নিয়ে ফিরে গেল তারা ক্লাবে।

এই ঘটনার পরদিন থেকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দৈনিক ছয় টাকা বেতনে একজন লোক নিয়োগ করা হলো হাইকোর্ট মাঠে।

কার হাসি কে হাসে

ঢাকা ফুটবল লীগে বিআরটিসি-আদমজীর খেলা পরিচালনা করছিলেন রেফারী রফিকুল আলম। বিপজ্জনক খেলার কারণে এক পর্যায়ে তিনি লাল কার্ড প্রদর্শন করেন বিআরটিসির রনজিতকে। ক্ষুব্ধ রনজিত রেফারীর দিকে তেড়ে গেলেও তাঁর সতীর্থ খেলোয়াড়েরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন মাঠের বাইরে।

ওদিকে বিআরটিসির আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়াড় লাতুকেও মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর খেলা শুরু হলে লাল কার্ড পাওয়া রনজিত আবার মাঠে ঢুকে খেলতে শুরু করেন এবং খেলা চালিয়ে যান শেষ পর্যন্ত। খেলা শেষ হলে রেফারী জানান, লাল কার্ড

তিনি আসলে দেখিয়েছিলেন রনজিতকে নয়, লাতুকে।

ফুটবলে স্থিতিস্থাপকতা

ফুটবলের বলটির স্থিতিস্থাপকতা খেলার ফলাফলের ওপরে কি কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ইংল্যাণ্ডের বিংলে শহরের

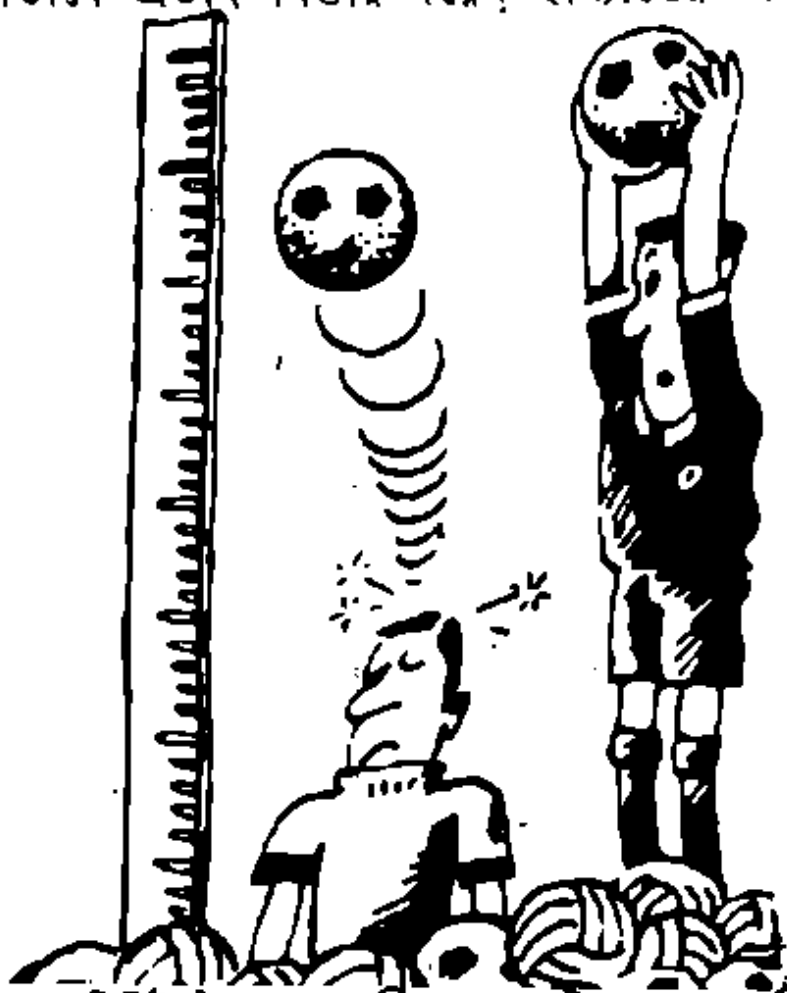

গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, আপাতভাবে একইরকম বলে মনে হয়, এমন কয়েকটি বল যদি আলাদা আলাদাভাবে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে মাটিতে পড়ার পর বিভিন্ন

বল বিভিন্ন উচ্চতায় লাফিয়ে ওঠে। এবং ফুটবল খেলায় যেহেতু বল অসংখ্যবার 'ড্রপ' খায়, তাই হুবহু একই রকমের খেলায় ভিন্ন ভিন্ন বল ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল আসতে বাধ্য।

মজার ব্যাপার এই যে, টেনিসে টেনিস বলের 'বাউন্স স্ট্যাণ্ডার্ড' দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত, অথচ ফুটবলে সে-রকম কিছু নেই এখন পর্যন্ত।

নিঃস্বার্থ কর্মী

স্পেনের ফুটবল সমর্থকেরা বরাবরই কোলাহলপ্রিয়। মেক্সিকোর বিশ্ব-কাপে একজন স্প্যানিশ সমর্থককে দেখা গেছে বিশাল আকৃতির ড্রাম নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করতে। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো, নিজ দেশের সমর্থকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাওয়া, চিৎকার করে সমর্থন করতে উজ্জীবিত করা। টেলিভিশন-ক্যামেরা তার দিকে ফোকাস করা মাত্র ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় সে। ক্যামেরার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ দেখা যায়নি। বরং সে বারবার ক্যামেরার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, তারপর উচ্চস্বরে গান গেয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে মনোনিবেশ করেছে নিজের কাজে।

স্বর্গ থেকে সাহায্য

সুইজারল্যাণ্ড প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের 'সেন্ট-হ্যালেন' এবং 'ক্স্যামাক্স্' দলের খেলায় একটি মুহূর্তে 'সেন্ট হ্যালেন' দলের স্ট্রাইকার বিপক্ষ দলের পেনাল্টি সীমানায় পড়ে গেল। পেনাল্টি? না। খেলা চালিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিলেন রেফারী। 'সেন্ট-হ্যালে-

নের' খেলোয়াড়রা তুমুল প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে রেফারী একজনকে লাল কার্ড' দেখিয়ে বের করে দিলেন মাঠ থেকে।

খেলা শেষ হলো ২-১ গোলে—'কৃস্যামাকৃস্' দলের অনুকূলে। কিন্তু রেফারীর ড্রেসিং-রুম ঘিরে বসে রইলো ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা। রেফারীকে তারা ঢুকতে দেবে না কৈফিয়ত না দেয়া অব্দি। মহাবিপদ! পুলিশ বার-কয়েক তাড়া করলো তাদেরকে। কিন্তু তারা অনড় বসে রইলো।

শেষমেষ ঘণ্টাখানেক পরে সাহায্যের হাত এগিয়ে এলো, ঠিক যেন স্বর্গ থেকে। হেলিকপ্টার নামলো মাঠে এবং রেফারীকে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

আধঘণ্টার রাজা

স্পেনে একবার লীগে যখন ১৪টি খেলা খেলেছে কারদোভা ফুটবল দল, এর মধ্যে তাদের প্রশিক্ষক বদল হয়েছে ছয় বার। শেষজন প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন মাত্র আধঘণ্টা।

নিযুক্তির পরপরই ক্লাব কর্মকর্তাদের নির্দেশ শুনে তিনি সরাসরি মন্তব্য করেছিলেন, 'ফুটবলের ব্যাপারে আপনাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই।'

অবশ্য প্রেসক্রিপশন

বার্মিংহামের একজন ডাক্তার তাঁর রোগী রয় ফ্লেচারকে নিয়মিত ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আটচল্লিশ বছর বয়স্ক ফ্লেচারের রক্তচাপ ছিলো খুব নিচু। এবং ফ্লেচার যেহেতু

বার্মিংহাম দলের সমর্থক, অতএব স্টেডিয়ামে নিয়মিত হাজিরা তাঁর রোগ নিরাময়ে সুফল বয়ে আনবে বলে ডাক্তারের বিশ্বাস।

মহিলা ফুটবল-তারকা

মহিলা ফুটবলে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা এলিজাবেথ ভিনিয়তি। জন্ম ইতালিতে। ২৬২টি খেলায় অংশ নিয়ে গোল দিয়েছেন ৩২০টি। অসাধারণ নৈপুণ্যই বলা যায়। তবে এলিজাবেথ কিন্তু পেশাদার খেলোয়াড় নন, বোরগোন্‌জোলা শহরে তিনি পত্রিকা বিক্রি করেন। শহরের ফুটবল-উৎসাহীরা তাঁর কাছ থেকে পত্রিকা কেনার পক্ষপাতী। কারণ কিনতে গেলে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করা যায় একজন ফুটবল-তারকার সাথে। সেটাও তো কম আকর্ষণের ব্যাপার নয়।

পেশাদারী সহিষ্ণুতা

ইতালির ফুটবল রেফারী গোরেলি একবার অসাবধানতাবশত বাসের ভীড়ে পা মাড়িয়ে দিলেন একজন যাত্রীর। যাত্রীটি প্রাণভরে গালাগাল করলো গোরেলিকে।

গোরেলি কিন্তু নিশ্চুপ। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তাঁর মুখে।

বিস্মিত যাত্রীটি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'কথা বলছেন না যে! মুখ ভর্তি জল নাকি আপনার?'

গোরেলি উত্তর দিলেন শান্তস্বরে, 'সেনিয়র, আপনার বোধহয় জানা নেই, পেশায় আমি একজন রেফারী।'

বিশ্বকাপ এবং ব্যবসায়ীর পৌষ মাস

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হলেও সেই উপলক্ষে ঘরে বসে দাঁও মেরেছে ঢাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ীরা। সেই মৌসুমে শুধু ঢাকা শহরেই বিক্রি হয়েছিলো ৬ হাজার টিভি সেট !

ঝুঁকি নেবেন না

১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছিলো ব্রাজিল। সেটার প্রস্তুতি চলছিলো মহাসমারোহে। মারাকানা নদীর তীরে নির্মাণ শুরু হলো বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম। তিন তলা উঁচু এই স্টেডিয়ামে ২ লাখ দর্শকের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হলো।

চতুর্থ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে এই স্টেডিয়ামে। খেলবে ব্রাজিল আর মেক্সিকো। জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখার জন্যে উৎসুক সবাই। দর্শকদের ভীড় শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই। অথচ স্টেডিয়ামের কাজ কিছুটা বাকি আছে তখনও। স্টেডিয়ামের চারদিকে মিস্ত্রিদের বানানো বাঁশের ভারা খোলা হয়নি। অতি উৎসাহী কিছু দর্শক ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়লো সেগুলোর ওপরেই।

একসময় হঠাৎ করে ভেঙে পড়লো বাঁশের ভারা। আহত হলো অনেক দর্শক।

লাল-হলুদের গল্প

স্কটল্যাণ্ডের 'গ্ল্যাসগো রেইঞ্জার্স' দলের গ্রেগর স্টিভেন্স একটি বিশেষ

ধরনের রেকর্ডের অধিকারী। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি সর্বমোট পাঁচটি লালকার্ড এবং উনিশটি হলুদ কার্ড পেয়েছিলেন। এরপর ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে সাসপেণ্ড করে ছয় মাসের জন্যে। গত তিরিশ বছরে বৃটেনের ফুটবলে এতো কঠিন শাস্তি পায়নি আর কোনো খেলোয়াড়।

উচাটন মন

১৯৮৩ সালে টমিডোহার্টকে স্কটল্যাণ্ড জাতীয় ফুটবল দলের প্রশিক্ষক নির্বাচনের প্রস্তাবে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডার সূচনা হলো। বেশ কিছু সাংবাদিক খতিয়ান ঘেঁটে প্রমাণ করে দেখালো—টনি ডোহার্ট এক জায়গায় বেশিদিন কাজ করতে পারেন না। তেইশ বছরের প্রশিক্ষক জীবনে তিনি ক্লাব বদল করেছেন ১২ বার।

প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে ফুটবল ফেডারেশন নতুন প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে বাধ্য হলো।

সমর্থক ও প্যারাশুট জাম্পার

১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার সময় পশ্চিম জার্মানির একজন ক্রীড়া-চিকিৎসক মজার এক গবেষণা চালিয়েছিলেন। বিশেষ এক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের এবং দু'জন সহকর্মীর 'পাল্‌স্‌' পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যেকার এই ফাইনাল খেলা শুরু হবার আগে তিনজনের 'পাল্‌স্‌ বীট' ছিলো ৮০ থেকে ১০০-র ভেতরে। পশ্চিম জার্মানি যখন এক গোলে এগিয়ে গেল, তখন

সেটা গিয়ে দাঁড়ালো ১৪০-এ। ইংল্যাণ্ড খেলায় সমতা আনলে সেটা ১৩৫-এ নেমে গেল। আরো একটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল ইংল্যাণ্ড—১৪০। খেলা শেষ হবার কয়েক সেকেণ্ড আগে পশ্চিম জার্মানি খেলায় সমতা আনলো একটি গোল করে। তাঁদের তিন-জনের পাল্‌স্ বীট গিয়ে পৌঁছুলো ১৯৬-এ। বস্তুত, সাধারণ শরীরের পক্ষে এটা প্রায় অসহনীয় চাপ।

তুলনার খাতিরে জানানো উচিত, ঝাঁপ দেবার পর কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত প্যারাশুট জাম্পারের পাল্‌স্ বীট থাকে ১৯০।

খেলোয়াড়সুলভ

মেক্সিকো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা ইংল্যাণ্ডের মুখোমুখি হলে ১৯৮২ সালের ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক আর্জেন্টিনার অধিবাসী ম্যারাডোনাকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মতো খেলতে আহ্বান জানায়।

কিন্তু চার বছর আগে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি চান-নি ম্যারাডোনা। তিনি তাদের আহ্বানের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমরা রাজনীতি করতে আসিনি, খেলতে এসেছি।'

মেদ ঃ প্রতি কেজি ১০০০ মার্ক ঃ

পশ্চিম জার্মানির 'স্টুটগার্ড' দলের প্রশিক্ষক অ্যালবার্ট সিংগ দলের স্থূলকায় লিংকম্যান হ্যান্স এটমাইয়েরকে শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কাজ হয়নি। হ্যান্স বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন—এই বাড়তি ওজন তাঁর খেলায়

বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটায় না।

বিতর্কের অবসান ঘটাতে শরণ নেয়া হলো নিরপেক্ষ ব্যক্তির। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে স্বাভাবিক খেলা খেলতে হলে হ্যান্সকে অন্তত চার কিলোগ্রাম ওজন কমাতে হবে।

প্রশিক্ষক অ্যালবার্ট সিংগ তিন সপ্তাহ সময় দিলেন হ্যান্সকে এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'মনে রেখো, তিন সপ্তাহ পর অতিরিক্ত এক কিলোগ্রাম ওজনের জন্যে এক হাজার মার্ক ফাইন দিতে হবে তোমাকে।'

অপেরা না ফুটবল ?

বিখ্যাত ইতালীয় অপেরা-গায়ক জিনো কোলেতি ছিলেন ভয়ানক-রকম ফুটবল ভক্ত। খেলা দেখে বিধ্বস্ত কণ্ঠ নিয়ে অপেরায় হাজিরা দিতেন বলে প্রায়ই রাগারাগি করতেন অপেরার মালিক। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝেমাঝে এই কারণে অপেরা স্থগিত রাখতে হয় কিংবা জিনো কোলেতির জায়গায় গাওয়াতে হয় অন্য কাউকে দিয়ে।

একবার নতুন একটা অপেরার প্রথম প্রদর্শনীর আগে খেলা দেখে ফিরলেন জিনো কোলেতি। মাঠে এতো চিৎকার করে এসেছেন যে কোনো স্বরই বেরুচ্ছে না তাঁর কণ্ঠ দিয়ে। এবার আর সহ্য করতে পারলেন না মালিক বেচারা। ইতালীর অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রতিভাবান অপেরা-গায়ককে অবলীলায় বের করে দিলেন।

পারফেকশনিস্ট

রুমানিয়ার রেফারী ইয়োয়ানিগ্না ফ্রান্সের মধ্যমাঠের খেলোয়াড়

লুইস ফার্নান্দেজকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। কারণ কী ? না, ফার্নান্দেজের মোজাজোড়া ঢিলে হয়ে ঝুলছিলো পায়ের গোড়ালির কাছে এবং জার্সি 'ইন' করা ছিলো না। মাঠের বাইরে

গিয়ে মোজাজোড়া ওপরে টেনে তুলে, এবং জার্সি শর্টসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার মাঠে ফিরে এলেন ফার্নান্দেজ।

ঘটনাটা ঘটেছিলো মেক্সিকো বিশ্বকাপে ফ্রান্স-ইতালি খেলায়।

লাল রুমাল, নীল রুমাল

খেলা চলছিলো দু'টি যুগোস্লাভিয়ান দল 'খাইদুক' এবং 'রাদ্‌নিচ-কি'-র মধ্যে। মাঠে 'খাইদুক' দলের খেলোয়াড় জাইইয়ার আচরণ ছিলো অদ্ভুত। খেলার উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলোও যেন তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করছিলো না। তিনি বারবার তাকাচ্ছিলেন স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত হাসপাতালের জানালাগুলোর দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতে লাগলো দর্শকেরাও।

হঠাৎ হাসপাতালের একটি জানালায় লাল রুমাল উড়তে দেখা গেল। লাফিয়ে উঠলেন জাইইয়া। দু'হাত ওপরে তুলে উল্লাস প্রকাশ করে মনোনিবেশ করলেন খেলায়। বল তাঁর পায়ে এলে একেবারে যেন ঝলসে উঠলেন তিনি। গোল করলেন অসাধারণ দক্ষতায়।

খেলা শেষ হলে জানা গেল, জাইইয়ার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা অবস্থায় ভর্তি ছিলেন সেই হাসপাতালে। সেখানে নার্সের সাথে চুক্তি করেছিলেন জাইইয়া—তাঁর স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করলে নার্স লাল রুমাল উড়িয়ে সংকেত দেবে তাঁকে, কন্যাসন্তান হলে নীল রুমাল।

হুমকির মুখে

১৯৮৪ সালের বার্সেলোনা দল ইংল্যাণ্ডের টেরি ভেনাইব্‌লসকে আর্জেন্টিনিয়ান কোচ মেনোত্তির স্থলাভিষিক্ত করলো এবং মারাদোনা চলে গেল ইতালীর নাপোলী ক্লাবে। স্পেনের ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলেন।

কিন্তু লীগের শুরুতেই অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সবাই-কে চমকে দিলো বার্সেলোনা। প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যসব দলের মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো তারা। নতুন ইংরেজ কোচকে চারদিক থেকে ভীতি প্রদর্শন করা শুরু হলো। টেলিফোন এবং বেনামী চিঠিতে হুমকি দেয়া হলো অনবরত—'বেঁচে থাকতে চাইলে স্পেন ছাড়ো।' টেরি ভেনাইব্‌ল্‌সের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন বার্সেলোনা ক্লাবের কর্মকর্তারা।

'হুমকিতে আমি ভয় পাইনি মোটেও,' বলেছেন ভেনাইব্‌ল্‌স, 'বরং এতে নিজের সামর্থ্য এবং ক্ষমতার ওপরে আমার আস্থা বেড়ে গেছে অনেক।'

বিশ্বকাপ স্পেশাল

ফুটবল কি মানুষকে উদার করে দেয়? নইলে রোমের জেল কর্তৃপক্ষ জেলের একটি নিয়ম ভঙ্গ করবেন কেন? মেক্সিকোর বিশ্বকাপের সময় কয়েদীদের আত্মীয়-পরিজন ফুটবল খেলা দেখার জন্যে একুশটি টেলিভিশন দিয়ে যায় জেলে। জেল কর্তৃপক্ষও আইন ভেঙে কয়েদীদের অনুমতি দিয়েছিলেন টেলিভিশনে খেলা দেখার।

লেখাপড়া ও ফুটবল

আপনার বালক সন্তানটি কি ফুটবলের ভক্ত এবং একইসাথে লেখা-পড়ায় ঘোর অমনোযোগী? সেক্ষেত্রে আপনার জন্যে সুসংবাদ।

স্পেনের একটি শহরের কিছু অভিভাবক অভিনব উপায়ে তাঁদের সন্তানদেরকে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছেন। বার্ষিক

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারলে তাদেরকে পরবর্তী ফুটবল মৌসুমের সীজন টিকেট কিনে দিচ্ছেন তাঁরা।

পাখির লড়াই

লণ্ডনের একটি স্টেডিয়ামে একবার ফুটবল খেলা হয়েছিলো যেটাতে প্রতিদ্বন্দ্বী দল দু'টোর নাম ছিলো, 'দ্য ফ্যালকন্‌স্‌' এবং 'দ্য হক্‌স্‌'। খেলাটি পরিচালনা করেছিলেন রেফারী মার্টিন বার্ড।

একশো বছরে একবার

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালির চমকপ্রদ বিজয়ের পর ইতালিতে উৎসবের ঢল নামে। খেলার সরাসরি সম্প্রচার শেষ হবার সাথে সাথে লাখ লাখ লোক নেমে পড়ে রাস্তায়। নেচে, গেয়ে, পান করে তারা পালন করতে থাকে এই অবিস্মরণীয় বিজয়োৎসব। রাজধানী রোমের কেন্দ্রে অবস্থিত বিখ্যাত 'ত্রেভি' ফোয়ারায় শুরু হয়ে যায় গণ-গোসল। অদূরে এক গাড়িতে বসে নীরবে এই কাণ্ড লক্ষ্য করে তিনজন পুলিশ। কেবল মাঝে-মধ্যে মাইকে লোকদের তারা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই ফোয়ারা একটা ঐতিহাসিক স্থান, এটার অসম্মান করা উচিত নয়।

'অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কেন হস্তক্ষেপ করছে না?' এই প্রশ্নের জবাবে পুলিশ অফিসার বললেন, 'লোকজন একটু আমোদ-ফুর্তি করছে, করুক। এমন ঘটনা একশো বছরে একবারই ঘটে।'

বেশি কিছু নয়

লণ্ডনের একটি পত্রিকায় ১৯৮৬-র বিশ্বকাপের সময় একটি খবর

প্রকাশিত হলো যে, আয়ারল্যাণ্ড দলের ফুটবলারেরা মেক্সিকোর তরুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ডিস্‌কো নাচে। ফুটবলারদের উদ্বিগ্ন স্ত্রীরা খবর প্রকাশের সাথে সাথে মেক্সিকোয় টেলি ফোন করে আসল ঘটনা জানতে চাইলেন। নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করবার চেষ্টা করে ফুটবলারেরা তাঁদের স্ত্রীদের আরো সন্দেহপ্রবণই করে তুললেন শুধু।

একজন ফুটবলার কেবল স্বীকার করেছেন যে, নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা বাধা দেয়ার ফলে মেক্সিকোর তরুণীরা ডিস্‌কোতে আসার সুযোগ পাচ্ছিলো না বলে তাঁরা তাদের ঢুকতে দেয়ার অনুমতি দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে। এর বেশি কিছু নয়।

বুড়ো অ্যাক্রোব্যাট

ফ্রান্সের রেইমস শহরের চুয়াত্তর বছর বয়সের এক বুড়ো পয়সা বাঁচানোর জন্যে সারাজীবন স্টেডিয়ামের দেয়াল টপকে খেলা দেখতে ঢুকেছেন। কিন্তু একদিন এই কাজটি করতে গিয়ে ভারসাম্য রাখতে না পেরে বেমক্কাভাবে পড়ে যান এবং তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ফুটবলারেরা এমন নিবেদিতপ্রাণ-ভক্তের দুর্ঘটনার খবর শুনে তাঁকে দেখতে এসে ফুলের তোড়া উপহার দেন!

তোড়ার ভেতরে রাখা ছিলো স্টেডিয়ামে ঢোকার আজীবন পাস।

বডিগার্ড

গোটা ফ্রান্সে সম্ভবত একমাত্র রেফারী মাতিয়ে, যিনি খেলা শেষ

করে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নির্বিঘ্নে মাঠ ত্যাগ করেন এবং তাঁকে দেখে মনে হয় না, তিনি ক্ষিপ্ত সমর্থকদের আক্রমণের আশঙ্কা করে ভীত বোধ করছেন।

রহস্যটা আসলে অন্য জায়গায়। জানা গেছে, খেলা শেষ করার পর তাঁকে পাহারা দিয়ে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান তাঁর স্ত্রী, যিনি পুলিশের একটি স্কুলে জুডো কারাতের শিক্ষক। তাঁর দাপটে অতি উগ্র কিছু সমর্থককেও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে দেখা গেছে।

কোচেরা, সাবধান!

পশ্চিম জার্মানির পরিসংখ্যানবিদ এবং ডাক্তারেরা গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: আশির দশকে প্রথম বিভাগ ফুটবল ক্লাবগুলোর কোচদের গড় বয়স ক্রমশই বেড়েছে। বর্তমানে সেটা গিয়ে ঠেকেছে ৪৬ বছরে। কোচদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে—প্রত্যেক কোচই, অল্পস্বল্প হলেও, হৃদরোগে ভুগছেন। আর তাদের মধ্যে ৬০% কোচের অবস্থা রীতিমতো আশঙ্কাজনক।

প্রায়শ্চিত্ত

ইতালির 'ইন্তারনাসিওনালে' দলের একটি খেলা চলাকালে সেই দলের আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় অ্যাঞ্জেলিলোর ব্যক্তিগত গাড়িটি স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে চুরি হয়ে যায়। পরদিন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হলো এই সংবাদ। এবং সেদিনই অ্যাঞ্জেলিলো তার হোটেলের গাড়িবারান্দায় গাড়িটি আবিষ্কার করলেন। কাছে

গিয়ে দেখলেন তিনি, গাড়ির ভেতরে ফুলের তোড়া রাখা এবং তেলের ট্যাংকও পরিপূর্ণ।

বুঝলেন অ্যাঞ্জেলিলো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তাঁরই কোনো এক ভক্ত।

অনন্য

ব্রাজিলের অ্যারামবো শহরে একটি অভিনব আবাসিক হোটেল আছে। সেখানে রুমের খাটগুলো তৈরি গোলপোস্টের ধরনে, অ্যালার্মের বদলে বেজে ওঠে রেফারীর বাঁশি, লাঞ্চপর্ব ঠিক নব্বুই মিনিটের। রুম নম্বরের জায়গায় ঝুলছে বিভিন্ন ফুটবলারদের ছবি। হোটেলের একতলায় আছে 'ওয়ার্ল্ডকাপ মিউজিয়াম' নামের ছিমছাম, মনোরম একটি যাদুঘর। আরো আছে 'সেলুন পেলে', 'বার গারিঞ্চা'।

জিকোর জরিমানা

ইতালির 'ইউডিনেজ' ক্লাবের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে আকাশ থেকে পড়লেন যেন—'নিশ্চয়ই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এর মধ্যে।' কর্তৃপক্ষের শরণ নিতেই তাঁরা জানলেন, কোনো ভুল বোঝাবুঝিই হয়নি, হয়েছে আইন ভঙ্গ। আর আইন সবার জন্যেই এক।

ব্রাজিলের বিখ্যাত খেলোয়াড় জিকোর ইতালি আগমনের পাঁচ মাস পরের ঘটনা এটি। কর্তৃপক্ষের দাবী, সম্প্রতি গৃহীত আইনের পরিপন্থী কাজ করেছেন জিকো। কারণ এই নতুন আইন অনু-

বাসী, যে কোনো বিদেশী ইতালির কোনো শহরে আসার অব্যবহিত পর পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করে নিতে বাধ্য। যদিও স্থানীয় শহরের প্রত্যেকেই জানে—জিকো কোথায় থাকেন, বাসাটি কেমন, পরিবারে সদস্য সংখ্যা ক'জন (শুধু এই শহরে কেন, গোটা ইতালি জানে এসব কথা),—তবু জিকো আইনের চোখে অপরাধী।

বাধ্য হয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে রেজিস্ট্রি করে নিলেন জিকোর নাম এবং পরিশোধ করে দিলেন আইন অমান্য করার অপরাধে জিকোর জরিমানা।

বিলম্বিত অবতরণ

খেলা চলছে পশ্চিম জার্মানির 'রামশিড' এবং 'কিকার্স' নামের দল দু'টোর মধ্যে। হঠাৎ বলা নেই-কওয়া নেই, দু'জন প্যারাশুটিস্ট এসে নামলো মাঠের ঠিক মাঝখানে। খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হলো।

স্থানীয় প্যারাশুটিস্ট ক্লাবের এক প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন, দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেবার জন্যে প্যারাশুটিস্ট দু'জনের মাঠে নামার কথা ছিলো খেলা শুরু হবার ঠিক আগে। তারা ঝাঁপও দিয়েছিলো সময়মতোই। কিন্তু অজানা কারণে তাদের বিলম্ব হয়েছে ল্যাণ্ডিং-এ।

ব্যক্তিগত ব্যবস্থা

১৯৮১ সাল থেকে মেক্সিকোর বিখ্যাত ফুটবলার হুগো সানচেজ সব-

সময় ব্যক্তিগত ম্যাসাজম্যান সাথে রাখেন। দলের ম্যাসাজম্যানের সাহায্য নেবার পক্ষপাতী তিনি নন।

পার্লামেণ্টে ফুটবল

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের অনেক সদস্যই অধিবেশন চলাকালে পকেট-রেডিওর সাহায্যে খেলার ধারাবিবরণী শুনে থাকেন। তবে সমর্থক-সুলভ উচ্ছ্বাস প্রকাশ সেখানে অবশ্য সম্ভব হয় না।

বেলজিয়ামের পত্রিকা 'পুরকুয়া পা' ইংল্যাণ্ডে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছে : পার্লামেণ্টে হঠাৎ গুঞ্জন উঠলে বুঝতে হবে, এই গুঞ্জনের কারণ অন্য কোনো সদস্যের সরস কিংবা তির্যক রাজনৈতিক মন্তব্য নয়। 'লিভারপুল' গোল করেছে, এটা তারই শৃঙ্খলিত উচ্ছ্বাস।

বাদাম বিক্রি বন্ধ

ইংল্যাণ্ডের 'ব্রেডফোর্ড' দলের কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের একই অভিযোগ দলের সমর্থকেরা খেলার মাঠে দলকে যথাযথভাবে উৎসাহিত করে না।

ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো ক্লাব কর্তৃপক্ষ। অনু-সন্ধান করে দেখা গেল—স্টেডিয়ামে ঢুকে অধিকাংশ সমর্থকই বাদাম চিবুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং খেলা উপভোগ করে প্রায় নিঃশব্দে। সমস্যা নিরসনের জন্যে গ্যালারিতে বাদাম বিক্রি অচিরেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

দুঃখের রকমফের

বহু কষ্টে যোগাড় করা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনের টিকেট হারিয়ে ফেললেন মেক্সিকোর এক ক্রীড়াপ্রেমিক। অনেক অনুসন্ধান করেও তা পাওয়া গেল না। তীব্র মর্মবেদনা সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন তিনি এবং তাঁকে ভর্তি হতে হলো হাসপাতালে।

ক্ষিপ্ত প্রফেসর

পোল্যাণ্ডের সাথে ব্রাজিলের খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের ম্যানেজার সান্টানা সক্রেটিসের পরিবর্তে অন্য একজন খেলোয়াড় নামান। ফুটবলের প্রফেসর বলে খ্যাত সক্রেটিস এতো রেগে গিয়েছিলেন যে একসময় সান্টানার দিকে ঘুষি বাগিয়ে ধরেছিলেন।

ফুটবলীয় ঘড়ি

ইতালির রেফারী নিনো গুজি অবসর সময় ব্যয় করেছেন একটি অভিনব দেয়ালঘড়ি বানিয়ে। অদ্ভুত সেই ঘড়ি। প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টার বদলে শোনা যায় উদাত্ত চিৎকার, 'গোল'। ঘড়ির ডায়ালে সংখ্যার পরিবর্তে ফুটবলারদের ছবি আঁকা এবং তাদের জার্সির ওপরে ঘড়ির ক্রমমান অনুসারে সংখ্যা লেখা। অ্যালার্ম দিয়ে রাখলে নির্দিষ্ট সময়ে বেজে ওঠে রেফারীর বাঁশি।

ফুটবল-থেরাপি

হাঙ্গেরির এক হাসপাতালে বহুদিন ধরে পড়ে আছেন ইয়ানোশ পেক। এক দুর্ঘটনার পর তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

ডাক্তারদের অবিরাম প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে গেছে, বাকশক্তি ফিরে আসেনি।

একদিন শুয়ে শুয়ে ফুটবলের ধারাবিবরণী শুনছিলেন ইয়ানোশ পেক। খেলার এক মুহূর্তে তাঁর প্রিয় দল পেনাল্টির সুযোগ লাভ করলো। খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। ছুটে এলেন সব ডাক্তার এবং নার্স। দেখলেন, বাকশক্তি পুরোপুরি ফিরে পেয়েছেন ইয়ানোশ পেক।

পাচক থেকে টিভি-তারকা

মেক্সিকোয় খেলতে আসা পর্তুগাল দলের পাচক এদারিস্তো আলদারো মেক্সিকোর টেলিভিশনের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন বিশ্বকাপ চলাকালীন। দর্শকদের রান্না শিখিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি।

দুঃসাহস

খেলা চলছিলো নির্বিঘ্নে। হঠাৎ গ্যালারী থেকে রেফারীর উদ্দেশ্যে ভেসে এলো উচ্চস্বরে অকথ্য গালিগালাজ। ক্রোধ দমন করতে না পেরে রেফারী গ্যালারিতে ঢুকে গালি-দেয়া লোকটিকে দুমদাম চড়ঘুষি মেরে ফিরে এলেন মাঠে।

ঘটনাটা ঘটেছিলো ফ্রান্সের হাভরা শহরে। বলাবাহুল্য, এই ঘটনার পর বিরাট অংকের জরিমানা দিতে হয়েছিলো রেফারীকে।

বিজনেস

পেরুতে এক খেলা শেষে ফুটবলের কালো মানিক পেলে তাঁর জার্সি-টি গ্যালারিতে দর্শকদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন। ঘটনাক্রমে একজন লোক জার্সিটির মালিকানা লাভ করে।

দিনকয়েক পরে পত্রিকায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিজ্ঞাপন: 'ফুটবলের রাজা পেলের অতি সম্প্রতি ব্যবহৃত দশ নম্বর জার্সিটি না ধোয়া অবস্থায় বিক্রি হইবে। উৎসাহীরা যোগাযোগ করুন।'

ফুটবলে গ্র্যাণ্ডমাস্টার

পেসকারে অনুষ্ঠিত ইতালির বিপক্ষে প্রদর্শনী ম্যাচে নরওয়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামলেন কুড়ি বছর বয়স্ক নতুন সেন্টার ফরোয়ার্ড সিমে অ্যাগ্‌ডেস্টাইন। স্থানীয় 'লিউন' দলের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড। দুর্ধর্ষ নৈপুণ্য দেখানোর জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে জাতীয় দলে। খেলার শুরুতে নরওয়ে দল এক গোলে পিছিয়ে পড়ে। পরে অ্যাগ্‌ডেস্টাইনের অর্জিত পেনাল্টির সদ্ব্যবহার করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলেও নরওয়ে দল পরাজিত হয় ১-২ গোলে।

বলাবাহুল্য, দলের নবাগত খেলোয়াড় সিমে অ্যাগ্‌ডেস্টাইন নরওয়ের একমাত্র গ্র্যাণ্ডমাস্টার-দাবাড়ু। তিনি এই উপাধি অর্জন করেন আঠারো বছর বয়সে।

ডোন্ট কল ইন লাভ

মেক্সিকোর বিশ্বকাপে সাংবাদিকদের সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিলো বেশ কিছু সুদর্শনা তরুণী। তাদের সবার বয়স

সতেরো থেকে তেইশের মধ্যে। কোনো সাংবাদিকের সাথে মানসিক এবং রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিলো তাদের ওপরে। বলা হয়েছিলো চাকরি-বহির্ভূত যে-কোনো কাজের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে।

বিদেশী আগ্রাসন

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী ইংল্যাণ্ড জাতীয় দলে ১৯৮৫ সালের ইংলিশ লীগ বিজয়ী 'লিভারপুল' দলের একজন খেলোয়াড়ও ছিলো না। কারণ, 'লিভারপুলের' প্রধান ১১ জন খেলোয়াড়ই ছিলো বিদেশী।

বিরল শাস্তি

১৯৮৩ সালে স্কটল্যাণ্ডের 'অ্যাবেডিন' দলের প্রশিক্ষক অ্যালেক্স ফেরহিউসন একবার উঁচু গলায় তর্ক করেছিলেন রেফারীর সাথে। এই কারণে মাঠে কোচের জন্যে নির্ধারিত জায়গায় তাঁর বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো দেড় বছরের জন্য।

সাবধান !

টমাস হেনশ'র নিবাস নাইজেরিয়ায়। গ্যালারিতে উশৃঙ্খল আচরণের দায়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে স্টেডিয়ামে তার উপস্থিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু কি তাই ? সে যদি স্টেডিয়ামের একশো মিটারের মধ্যে ঢোকার দুঃসাহস করে, পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করবে।

দুই সিংহের বিবাদ মীমাংসা

মেক্সিকো বিশ্বকাপের সময় এবং তার পরে এই শতাব্দীর দুই প্রজন্মের দুই শ্রেষ্ঠ ফুটবলার পেলে এবং মারাদোনা পরস্পরের প্রতি কটূক্তি করেছিলেন অসংখ্যবার। কিন্তু ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে যখন তাঁরা ইতালির মিলান শহরে মুখোমুখি হন পরস্পরের, তাঁরা উষ্ণভাবে করমর্দন করেন, আলিঙ্গন করেন পরস্পরকে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মারাদোনা বলেন: 'পেলের কোনো তুলনা হয় না। পেলে পেলেই। তাঁর রেকর্ড ভাঙা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

পেলে: 'মারাদোনা দুর্দান্ত ফুটবলার। কিন্তু ও তো আর আমার মতো ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপ জিতে নিতে পারবে না। আর ও যেহেতু ইতালিতে খেলছে, তাই আমার মতো অতো গোল-ও পাবে না।'

পেলের কথায় হেসে সম্মতি জানালেন মারাদোনা: 'আমরা যারা পেলের উত্তরসূরী, তাদের কেউই পেলের সাফল্যকে স্পর্শ করতে পারবো না।'

রমণীয় ফুটবল

১৯৭১ সালে ডার্বিশায়ারের রেফারীরা প্রমীলা ফুটবল লীগের খেলা পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বললেন: মহিলা ফুটবলারদের কোনোকিছু বোঝানো প্রায় অসম্ভব, ভীষণ অবুঝ তারা। এছাড়া, ফ্রী কিকের নির্দেশ দিলে ভয়ংকররকম

হেনালীপনা শুরু করে, ফল না হলে রেফারীকে আলিঙ্গন করে বসে। তবে সবচে' কঠিন অবস্থা হয় পেনাল্টির নির্দেশ দিলে। শুরু হয়ে যায় প্যানপ্যানানি, কান্নাকাটি। আর মেয়েদের চোখের জলের সামনে স্থির থাকতে পারে ক'জন পুরুষ ?

উৎসব বটে।

ফ্রান্সের বন্দরনগরী মার্সেলের 'অলিম্পিক' দল দেশের লীগ শিরোপা অর্জন করলে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে শহরটি। দলের খেলোয়াড়েরা যখন শহরের মূল সড়কটি গাড়িতে বসে প্রদক্ষিণ করছিলো, রাস্তার দু'পাশ থেকে তাদের ওপরে বৃষ্টির মতো বর্ষণ করা হয়েছিলো চকোলেট এবং লজেন্স।

পরদিন সকালে ঝাড়ুদারেরা ওগুলোর মোড়ক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখে। পরে মোড়কগুলি ওজন করে দেখা হয়। পাক্কা এক মণ !

দুধের স্বাদ ঘোলে

সমর্থকদের আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং ক্রোধের বহিঃপ্রকাশকে বাধা না দেয়া এবং একই সাথে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু মেক্সিকোর ভেরাকরুস শহরের স্টেডিয়ামে এটাকে সম্ভব করা হয়েছে।

আগে গ্যালারি থেকে রেফারীর উদ্দেশে পচা ডিম, টমেটো, স্যাণ্ডেল ইত্যাদি ছোঁড়া হতো। এখন সমর্থকদের নাগালের ভেতরে রাখা আছে বালির বড়ো বড়ো বস্তা, যেগুলোর গায়ে লেখা—

'রেফারী'। দর্শকরা এখন ওটার ওপরেই ঝাল মেটাচ্ছে।

অবাধ্য স্বামীর খোঁজতে

খেলা দেখার ব্যাপারে স্ত্রী রীতিমতো 'ভেটো' প্রয়োগ করা সত্ত্বেও স্বামী গেছেন স্টেডিয়ামে। দজ্জাল স্ত্রী লেন্টনার চললেন স্টেডিয়ামে স্বামীকে খুঁজতে। গেটে ঢুকবার সময় তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন বড়োসড়ো একটা অঙ্কের পুরস্কার। সেই ফুটবল মৌসুমে স্টেডিয়ামের এক লক্ষতম দর্শকের জন্যে বরাদ্দ ছিলো পুরস্কারটি।

ঘটনাটা ঘটেছিলো সুইডেনে।

প্রতিভা

আর্জেন্টিনার 'বারিকা' দলের স্টপার রবার্তো ভাস্‌কেস লীগের শুরুতেই বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী গোল করে বসেন। দলের প্রশিক্ষক এরনান্দো আগিরে রবার্তোকে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

'এমন প্রতিভা নষ্ট হতে দেয়া যায় না,' নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন এরনান্দো আগিরে।

ফুটবলের শত্রু

সান-পাউলু নামক ব্রাজিলের এক শহরে একটি বাড়ির সামনে এরকম একটি বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো আছে: 'এখানে বাস করে ফুটবলের ঘোর শত্রু। টেলিভিশনে ফুটবল দেখার কিংবা রেডিওতে ধারা-

বিবরণী শোনার দুরাশা করে কেউ আসবেন না আমার বাড়িতে। এখানে ফুটবল বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যাঁরা আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁদের বলি—স্বাগতম!'

ধড়িবাজী

দু'হাজার ডলার করে জমা দিয়েও মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ দেখতে যেতে পারেনি ইংল্যাণ্ডের চারশোজন ফুটবল সমর্থক। টিকেট এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা নিরসন করতে যে ট্র্যাভেলিং কোম্পানিকে তারা টাকা দিয়েছিলো, সেটি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছিলো এবং কোম্পানির নির্বাহী পরিচালকও হাওয়া।

বুড়োখোকা

ফুটবলের টিকেটের দাম ইংল্যাণ্ডে বেড়েই চলেছে ক্রমশ। এবং অতি স্বাভাবিক কারণেই দর্শকরা পয়সা বাঁচানোর নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে।

স্কুল বালকদের টিকেটের দাম অপেক্ষাকৃত কম। তাই স্কুল বালকের ছদ্মবেশে অনেক বয়স্ক লোক ঢুকে পড়ে স্টেডিয়ামে। শেফিল্ড স্টেডিয়ামের গেটে একবার তিনজন বয়স্ক লোককে আটকে দেয়া হয়, যাদের কাছে ছিলো কমদামী টিকেট। এইসব স্কুলবালকের মুখোশধারী লোকদের বয়স ছিলো ৩৮ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। আর নটিংহ্যামে ধরা পড়েছিলো ৫৮ বছর বয়সী এক 'স্কুলবালক'।

পদচিহ্ন

মানুষের শখ বড়ো বিচিত্র। কেউ জমায় ডাকটিকেট, কেউ বলপেন,

কেউবা অ্যাশট্রে কিংবা দিয়াশলাই, আবার কেউবা ট্রেনের টিকেট। কিন্তু একজন ফুটবলভক্ত কী জমাতে পারে? বিভিন্ন দলের মনোগ্রাম, ব্যাজ, দলীয় পতাকা, খেলোয়াড়দের ছবি, অটোগ্রাফ, জার্সি বৈ তো আর কিছু নয়।

কিন্তু ব্রাজিলের ফুটবল-পাগল মেরা শাদা কাগজে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের পদচিহ্ন সংগ্রহ করেন। পেলে, গারিঞ্চা, ডিডি, জিলমার, ডি স্টেফানোসহ অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড় তাঁদের পদচিহ্ন দিয়েছেন মেরার সংগ্রহ সমৃদ্ধ করতে।

মানভঞ্জন

পর্তুগালে অলিম্পিক ফুটবল দল ছিলো না দীর্ঘ ৫৮ বছর। দেশের ফুটবল ফেডারেশন অলিম্পিক দল গঠনে অনীহা প্রকাশ করে এসেছে বারবার। অলিম্পিক ফুটবলে পর্তুগাল শেষবারের মতো অংশ নিয়েছিলো ১৯২৮ সালে। দীর্ঘ ৫৮ বছর পর ১৯৮৬ সালের শেষদিকে আবার অলিম্পিক ফুটবল দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। পেশাদার ফুটবলারদের অলিম্পিকে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিল করা হলে পর্তুগীজ ফুটবল ফেডারেশন তাদের মত পাল্টায়।

অন্যরকম ভ্রমণ

মাইক এম্‌ক এবং ম্যাগি ডেভিস—কানাডার দুই টগবগে যুবক। আট হাজার কিলোমিটার পথ তারা সাইকেলে পাড়ি দিয়ে এলো মেক্সিকোয় ফুটবল খেলা দেখতে। টুর্নামেন্ট শেষে সরাসরি বাড়ি না

ফিরে আরো কয়েকটি দেশ ঘোরার পরিকল্পনা তাদের।

বাজি

ইতালির 'জুভেন্টাস' দল তখন তুখোড় ফর্মে। 'তোরিনো' দলের সাথে তাদের পরবর্তী খেলা। জুভেন্টাসের একজন সমর্থক তোরিনোর একজন সমর্থকের সাথে বাজি ধরলো—তোরিনো এই খেলায় হারবেই হারবে।

কিন্তু হারলো জুভেন্টাস ০-৪ গোলে। এবং বাজির শর্ত অনুযায়ী জুভেন্টাসের সমর্থককে পুরো এক সপ্তাহ শহরের কেন্দ্রে এসে হাতে ভর দিয়ে প্রতিদিন হাঁটতে হয়েছে পঞ্চাশ মিটার করে এবং চিৎকার করে অবিরাম বলতে হয়েছে—'ব্র্যাভো, তোরিনো।'

দু'বার লাল কার্ড

পেরুর 'লেয়ন' দলের কোচ-কাম-খেলোয়াড় খুয়ান মেলেনদেজ 'ডেপোরটিভো' দলের সাথে খেলার প্রথমার্ধে কোচের জায়গায় বসে অনবরত রেফারীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন এবং কারণে-অকারণে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হচ্ছিলেন তাঁর সাথে। অতিষ্ঠ হয়ে রেফারী কোচকে লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন মাঠ থেকে।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে খুয়ান বদলি খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে নেমেও রেফারীর সাথে তর্ক-বিতর্কে বিরতি না দিলে রেফারী তাঁকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেন দ্বিতীয়বারের মতো।

লাগাতার হরতাল

উরুগুয়ের পেশাদার ফুটবলের রেফারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে লাগাতার হরতালের ডাক দিয়েছিলেন ১৯৮১ সালে। কারণ, স্টেডিয়ামে রেফারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব। হরতাল শেষ হয়েছিলো নিরাপত্তা-ব্যবস্থা উন্নত করার পর।

অর্থনীতি এবং ফুটবল

মেক্সিকোর বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠান ব্রাজিলের দুর্বল অর্থনীতিকে অনেকাংশে পঙ্গু করে ফেলেছে বলে জানিয়েছে ব্রাজিলের একটি পত্রিকা। হিসেব করে দেখা গেছে, যেদিন ব্রাজিল জাতীয় দল অংশ নিয়েছে খেলায়, সেদিন 'ওয়াকিং আওয়ারের' হিসেবে দেশের ক্ষতি হয়েছে ৩৬৫ মিলিয়ন ডলার! আর পুরো বিশ্বকাপের সময় ক্ষতির পরিমাণ দেড় মিলিয়ার্ড ডলার।

খেলার দিনগুলোয় কলকারখানা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট—সব আগেভাগে বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত কাজ করেছে অর্ধেক দিন।

তবে এই ব্যাপারটি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করেছিলো বলে পত্রিকা জানিয়েছে।

নির্ভুল নিশানা

রেললাইনের ঠিক পাশেই স্টেডিয়াম। ঝিকঝিক করে ট্রেন চলেছে সেদিক দিয়ে। ইঞ্জিনচালক হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, স্টেডিয়াম থেকে একটি বল উড়ে এসে পড়লো দুই লাইনের ঠিক মাঝামাঝি। ট্রেন থামিয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। তারপর বলটা কুড়িয়ে নিয়ে

নির্ভুল কিকে সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন স্টেডিয়ামে।

খবরটি জানাজানি হবার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলেও ক্রীড়া সাংবাদিকেরা ইঞ্জিনচালকের ত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে দেয়া হলো স্টেডিয়ামে খেলা দেখার আমরণ পাস।

হারিয়ে বিবাদ

ইতালির 'ইন্তারনাসিয়োনালে' দলের একজন অন্ধ সমর্থক রোবার্তো পাওলিনি বাস করতেন মিলান শহরে। একদিন রেডিওতে ফুটবলের ধারাবিবরণী শুনছিলেন তিনি। এবং যেইমাত্র জানলেন তাঁর প্রিয় দল এইমাত্র একটি গোল করেছে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি দোতলা থেকে লাফ দিলেন। বেকায়দায় পড়ে তাঁর একটি পা গেল ভেঙে। তবু আনন্দে ঘাটতি পড়লো না তাঁর। মন্ত্র জপ করার মতো তাঁর প্রিয় দলের নাম উচ্চারণ করেই যাচ্ছিলেন তিনি।

অ্যাম্বুলেন্স এসে তাঁকে তুলে নেয়ার পরই কেবল তিনি জানলেন, তাঁর প্রিয় দল গোল করেছে ঠিকই, তবে আত্মঘাতী।

খুনী

খেলার ৭১ মিনিট ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে উরুগুয়ে ১-৬ গোলে হেরে গেল ডেনমার্কের কাছে। খেলা শেষে উরুগুয়ের কোচ রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট খেলা পরিচালনার অভিযোগ এনে বলেন, 'আজ মাঠে একজন খুনী ছিলো। খেলাটিকে সে হত্যা করেছে।'

ঘটনাটি ঘটেছিলো মেক্সিকো বিশ্বকাপে।

হলো না জানা

ইতালি ফুটবল দলের ম্যানেজার মেক্সিকোয় সাথে নিয়ে এসেছিলেন সাতটি পাইপ। ভেবেছিলেন, ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচে একটি করে পাইপ ব্যবহার করবেন তিনি। কিন্তু চতুর্থ খেলার পরই ইতালি দলকে বিদায় নিতে হয় টুর্নামেন্ট থেকে। চারটি খেলায় তিনি খরচ করেছিলেন চারটি পাইপ। বাকি পাইপ তিনটি তিনি কী করেছেন, তা আর পরে জানা যায়নি।

প্রক্সি

ইতালির ফালকোন শহরে ফুটবল খেলা চলছিলো। খেলার ফলাফলে তখনও সমতা। এই সময়ে অতিথি দলের অনুকূলে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারী। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গ্যালারিতে শুরু হয় অস্বাভাবিক চিৎকার এবং শিস।

খেলা থামিয়ে রেফারী পুলিশকে জানালেন, গ্যালারি দর্শকবিহীন না হলে তিনি আর খেলা পরিচালনা করতে পারবেন না। কাজে নেমে পড়লো পুলিশেরা। এক মিনিটে গ্যালারি সাফ। কারণ, দর্শক ছিলো সর্বসাকুল্যে তিনজন।

ত্রাণ তৎপরতা

ব্রাজিলের ফুটবল লীগের একটি খেলায় 'ফ্ল্যামেঙ্গো' দল মাঠে নামলো নয়জন খেলোয়াড় নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোল করে এগিয়ে গেল প্রতিপক্ষ 'আমেরিকা' দল।

কিন্তু বিখ্যাত 'মারাকানা' স্টেডিয়ামের দর্শকেরা অবাক হয়ে দেখলো, খেলা চলাকালীন একটা হেলিকপ্টার এসে 'ফ্ল্যামেঙ্গো' দলের অতিরিক্ত দু'জন খেলোয়াড়কে নামিয়ে দিয়ে গেল সরাসরি খেলার মাঠে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফিরে এলো খেলায়। এগারো জন খেলোয়াড় নিয়ে নতুন উদ্যমে খেলে খেলায় সমতা আনতে সমর্থ হলো 'ফ্ল্যামেঙ্গো' দল। খেলা শেষ হলো ১-১ গোলে।

অঢেল শুভেচ্ছা

১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হবার আগে দক্ষিণ কোরিয়া দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ যোগানোর জন্যে সিউল থেকে বিশাল একটি শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো হয়েছিলো। কার্ডটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে সাড়ে চার মিটার এবং তিন মিটার। পঁয়ত্রিশ হাজার সর্থমকের স্বাক্ষর ছিলো কার্ডটিতে।

মহামূল্য গোল

পশ্চিম জার্মানির আউগ্‌সবুর্গ শহরের এক স্কুলে ফুটবল খেলছিলো বালকের দল। ১৪ বছরের এক বালকের একটি শট ছিলো দুর্দান্ত। বানিয়ে নেয়া গোলপোস্ট পার হয়ে সামনের এক দালানের জানালার কাচ ভেঙে নিজের পথ করে নিলো বলটি। ঘরের ভেতরে রাখা কম্পিউটারে প্রচণ্ড আঘাত করে সেটার বারোটা বাজিয়ে তারপর সেটা ক্ষান্ত হলো।

হিসেব করে দেখা গেল, ক্ষতির পরিমাণ ৩২ হাজার জার্মান

মার্ক !

দাবীদার

পেলের জার্সিকে ঘিরে অবিশ্বাস্য ও অনন্য একটি রেকর্ড আছে। ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে শেষ খেলাটি যে-জার্সি পরে তিনি খেলেছিলেন, দেখা গেল, সেটি আছে সাতাশি জন লোকের কাছে!

মজার ব্যাপার এই যে, জার্সিগুলোর প্রতিটি মালিকই আলাদা আলাদাভাবে দাবী করেছেন যে, তাঁর হেফাজতে যে-জার্সিটি আছে, সেটিতেই মিশে আছে পেলের সর্বশেষ খেলার ঘাম।

লালে লাল খেলার মাঠ

ঘটনাটা সত্তুর দশকের গোড়ার দিকের। স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে 'সান্ ইজিদ্রো' এবং 'ওলিম্পিকো' দলের খেলা শেষ হতে বাকি ছিলো তিন মিনিট। এই সময় উভয় দলের খেলোয়াড়েরা একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রেফারীকে ঘিরে ধরে উচ্চকণ্ঠে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে। ক্রুদ্ধ রেফারী পকেট থেকে লাল কার্ডটি বের করে একে একে বাইশজন খেলোয়াড়কে সেটা দেখিয়ে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

ভাঙ্গাবাজ

ঘটনাটি স্কটল্যাণ্ড ফুটবল লীগের। 'আলবিয়ন রোভার্স' খেলছিলো 'হ্যামিলটন অ্যাকাডেমিক'-এর সাথে। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে একসাথে মাঠে নামলেন জিম ম্যাকেনসি এবং অ্যালান

স্মিথ। মাঠে প্রবেশ করে মধ্যমাঠ অব্দি পৌঁছুবার আগেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সাথে ঝগড়া ও হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন তাঁরা। রেফারী এসে লাল কার্ড দেখালেন দু'জনকেই। মাঠে নেমেও মাঠ ছাড়তে হলো তাদেরকে খেলা শুরু করার আগেই।

৫৫ গোল

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'আর্জেন্টিনা কাপ' প্রতিযোগিতায় পেনাল্টি কিকের ক্ষেত্রে অসাধারণ একটি রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিলো। খেলছিলো 'আদেলান্তি রিবেঙ্ক' এবং 'কাল্‌ভেস' নামের দুটি দল। নব্বই মিনিটের খেলা শেষ হলো ১-১ গোলে। দু'টি গোলই হয়েছে পেনাল্টি থেকে। এরপর টাইব্রেকারে ২৮-২৭ গোলে জয়ী হলো 'আদেলান্তি রিবেঙ্ক' দল।

দোষী থেকে বিচারক

গোলমুখের সামনে লব ফেলেছে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়। দলকে বিপদমুক্ত করতে গোলরক্ষক লাফিয়ে উঠে ঘুষি হাঁকালেন বলকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তাঁর আঘাত, ঘুষি গিয়ে লাগলো প্রতিপক্ষ দলের স্ট্রাইকারের মুখে। রেফারী সাথে সাথে মাঠ থেকে বের করে দিলেন গোলরক্ষককে। পরে ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁকে ফুটবল থেকে সাসপেণ্ড করা হলো এক বছরের জন্যে।

প্রিয় খেলা থেকে যাতে বিযুক্ত হতে না হয়, সে-জন্যে অভিযুক্ত গোলরক্ষক সিদ্ধান্ত নিলেন—তিনি রেফারী হবেন। এখন তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত রেফারীদের একজন। পশ্চিম জার্মানি নিবাসী

এই রেফারীর নাম ভুশ।

চেঁকি স্বর্গে গোলও

পশ্চিম জার্মানির একজন রেফারী মাঠে আসতেন সবসময় একটি ফিতে হাতে নিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ সব খেলার আগে সেই ফিতে দিয়ে তিনি গোলপোস্টের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা এবং মাঠের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিতেন খুব সতর্কতার সাথে। অনেকের কাছে ব্যাপারটি মনে হতো

বাহুল্য, কারুর মনে হতো পণ্ডিতী।

কিন্তু আসল খবর জানতো না তারা কেউ। রেফারী রুডল্‌ফ ক্রীটলীন পেশায় ছিলেন দরজি।

মারাদোনার পরাজয়

ফ্রান্স এবং ইতালি খেলার দিন মারাদোনা ইতালির পক্ষে বাজি ধরলেন সতীর্থ খেলোয়াড় জর্জ বুরুসাগার সাথে। কিন্তু আশা পূর্ণ হলো না তাঁর। ইতালি হেরে গেল। এর পর তাঁকে বাজি ধরতে বলা হলো ইংল্যাণ্ড-উরুগুয়ে খেলার দিন। ঘোর আপত্তি জানিয়ে মারাদোনা বললেন, 'এভাবে বাজিতে হেরে হেরে বিশ্বকাপ বোনাসের পুরো টাকাটাই খোয়াবো, অতোটা বোকা আমি নই।'

সাইড বিজনেস

স্পেনের বিখ্যাত ফুটবল দল 'বার্সেলোনা'র কোচ ছিলেন ইংরেজ টেরি ভেনাইব্‌ল্‌স। ক্রীড়া সাংবাদিকরা সবসময় মাতামাতি করেছে তাঁকে নিয়ে। এক সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা হঠাৎ করে আরো কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেল। ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?

জানা গেল, ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে তিনি বাজার মাত করে দিয়েছেন। এমনকি টেলিভিশন একটি ছবিও বানিয়েছে তাঁর উপন্যাস অনুসরণে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইতালির রেফারী এন্‌জো বারবারেস্‌কো 'এক কে বোলোনিয়া'

এবং 'আতলান্তা' দলের খেলা পরিচালনা করছিলেন। দুর্ঘটনা-বশত, খেলা যখন তুঙ্গে, তাঁর বাঁশিটি বিকল হয়ে যায় এবং অতি-রিক্ত কোনো বাঁশি তাঁর বা তাঁর সহযোগী লাইনম্যানদের কাছে তখন ছিলো না।

বারবারেস্কো কিন্তু এতে নার্ভাস হলেন না। মুখে আঙুল দিয়ে শিস বাজিয়ে খেলা চালিয়ে গেলেন দিব্যি।

কোচের স্বপ্নভঙ্গ

ব্রাজিলের সাথে খেলার আগের দিন রাতে স্পেনের কোচ স্বপ্ন দেখ-লেন, তাঁর দলের গেনজেলেজ গোল করেছে ব্রাজিলের বিপক্ষে।

ঘটনাটি মেক্সিকো বিশ্বকাপের। কোচের স্বপ্ন বাস্তবের মুখ প্রায় দেখেই ফেলেছিলো। গেনজেলেজের প্রচণ্ড কিক ব্রাজিলের গোল-বারে লেগে গোললাইন অতিক্রম করে আবার ফিরে আসে মাঠে। নিয়ম অনুযায়ী, এটা গোল হবার কথা। কিন্তু রেফারীর ভুলের কারণে গোলটি নাকচ হয়ে যায় এবং নস্যাৎ হয়ে যায় কোচের স্বপ্ন।

ফ্যাটি

ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘাকৃতি গোলকীপার ছিলেন ইং-ল্যাণ্ডের উইলি জে কোক (নিকনেম—'ফ্যাণ্ড')। তাঁর উচ্চতা ছিলো ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, ওজন ৩১১ পাউণ্ড! মৃত্যুর সময় তাঁর ওজন হয়েছিলো ৩৬৪ পাউণ্ড। একবার তিনি ক্রস বার ভেঙে খেলা পণ্ড করেছিলেন।

অসময়ে রিফ্লেক্স

নব্বই হাজার দর্শক অবলোকন করলো দৃশ্যটি। ব্রাজিলের 'মারাকানা' স্টেডিয়ামে লীগের শেষ খেলায় 'ফ্লুমিনেন্স' দল 'ব্যান্ড' দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে পরাজিত দলের সমস্ত খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা একযোগে তাড়া করেন রেফারীকে। অভিযোগটা কী? একটি ন্যায্য পেনাল্টি থেকে রেফারী তাঁদের বঞ্চিত করেছেন এবং তাঁর খেলা পরিচালনা ছিলো পক্ষপাতদুষ্ট।

পালিয়ে যাবার সময়েই রেফারী একজন খেলোয়াড়কে লাল কার্ড এবং তিনজন কর্মকর্তাকে হলুদ কার্ড প্রদর্শনে সক্ষম হন। পরে ঘটনাটি পুঙ্খানপুঙ্খরূপে তদন্ত করলে এই সত্যটি বেরিয়ে আসে যে, কর্মকর্তারা আসলে তাঁদের খেলোয়াড়দের আক্রমণের হাত থেকে রেফারীকে রক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

রেফারী পরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, ব্যাপারটি ছিলো পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃত। তাড়া খাওয়ার সময় স্বভাবসুলভ রিফ্লেক্স কাজ করে ওঠায় তাঁর হাত 'অটোমেটিক্যালি' পকেট থেকে হলুদ কার্ড বের করে এনে কর্মকর্তাদের দেখিয়ে দেয়।

নবাগত স্ট্রাইকার

খেলা হচ্ছিলো পশ্চিম জার্মানির দু'টি দল 'ডেলব্রুকা' ও 'ডোর্টমুণ্ডা'-র মধ্যে। দর্শকরা খেলা দেখে তিতিবিরক্ত। উত্তেজনাহীন এই খেলায় প্রাণ সঞ্চার করলো একটি কুকুর। কোত্থেকে ছুটে এসে মাঠে ঢুকলো সে। তারপর থাবা দিয়ে ফুটবলারের কাছ থেকে বলটি

কেড়ে নিয়ে ছুটলো একটি গোলবারের দিকে। গোল রক্ষককে হত-ভম্ব করে দিয়ে বলটি গোলবারে ঢুকিয়ে ক্ষান্ত দিলো কুকুরটি।

স্টেডিয়ামের পাঁচ হাজার দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালো 'নবাগত স্ট্রাইকারকে'।

অপরাধ ও শাস্তি

হাইতির ফুটবল ফেডারেশন ফুটবলারদের শাস্তির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। অভিযুক্ত খেলোয়াড়কে 'খেলার মাঠে ফুট-বলারের আচরণ কেমন হওয়া উচিত' বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখতে বাধ্য করা হয়। রচনা সুন্দর হলে আবার খেলার সুযোগ পায় খেলোয়াড়। না হলে সাসপেনশন।

ফুটবল বোকা

সুইডেনের মালসে শহরের স্টেডিয়ামে খেলা চলার সময় কোত্থেকে যেন আবির্ভাব হলো একটি খরগোসের। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, লোকজনকে সে ভয় পাচ্ছে না মোটেও। বরং গোলবার থেকে একটু দূরে বসে খেলা দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত খেলার সময়েও দেখা গেল খরগোসটিকে। ফুটবল মৌসুমের শেষের দিকে স্টেডিয়ামের একজন নিয়মিত দর্শক বনে গেল সে। মনে হলো, ফুটবল জয় করে নিয়েছে খরগোসের হৃদয়। মৌসুমের সর্বশেষ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ডেনমার্ক ও সুইডে-নের মধ্যে। হাজিরা দিতে ভোলেনি সে সেই খেলাতেও।

কিন্তু পরবর্তী মৌসুমের প্রথম বেশ কয়েকটি খেলায় তাকে দেখা

গেল না। অভ্যস্ত দর্শকেরা থরগোসের অপেক্ষা করতে লাগলো অধীর আগ্রহে। কিন্তু স্থানীয় দলগুলোর কোনো খেলাই দেখতে এলো না সে। মেলমোর একটি ক্লাব দল এবং পূর্ব জার্মানির লেপ-জিগ শহরের একটি ক্লাব দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ম্যাচে আবার আবির্ভাব হলো থরগোসের।

বোঝা গেল, রীতিমতো একজন ফুটবলবোদ্ধা বনে গেছে সে। যেমন-তেমন খেলা দেখে আর সময় নষ্ট করতে চায় না।

সফল প্রশিক্ষক

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাগুলোয় কে সবচেয়ে বেশি বার বিভিন্ন জাতীয় দলের প্রশিক্ষক ছিলেন? এলেনিয়ো এরেরা দাবি করেছেন, 'আমি'। এবং প্রকৃতপক্ষেও তাই। এই ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি একক এবং অনন্য। বিভিন্ন বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ফ্রান্স, স্পেন, ইতালির মতো বাঘা বাঘা ফুটবল দলের প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি।

'আমাকে পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ হিসেবেও নিয়োগ করা হয়েছিলো,' বলেছেন এরেরা। 'কিন্তু সেই সময়ে পর্তুগালের বেলে-নেসেস দল ছেড়ে আমি স্পেনের বার্সেলোনায় চলে আসি।'

কুয়াশাবৃত রহস্য

শীতকালে ইংল্যাণ্ডে ফুটবলার এবং রেফারীদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে খেলতে হয় এবং খেলা চালাতে হয় অতি ঘন কুয়াশার মধ্যেও। এমনি একদিন খেলা শেষ হলো ৩-৩ গোলে।

খেলা শেষে এক দলের স্ট্রাইকার জর্জ ওল্ড দুঃখ করে বললেন, 'আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি, আমি পাঁচটা গোল দিয়েছি। তবে নিজের বারে নাকি প্রতিপক্ষ দলের বারে, সেটা জানি না।'

রেফারী খেলা শেষের হুইসেল বাজিয়ে লক্ষ্য করলেন, উভয় দলই এগারো জনের পরিবর্তে আঠারো জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছে।

অঁাতেল মোরগ

ফ্রান্সের সমর্থকরাও কম যায় না। মেক্সিকোর মাঠে তারা নিরাপত্তা রক্ষীর চোখ এড়িয়ে একটি গৃহপালিত মোরগ নিয়ে ঢুকে পড়লো। ফরাসীদের প্রতীক—মোরগ। সে কিন্তু হাজার হাজার দর্শকের চিৎকার, হুল্লোড় শুনে কিংবা টেলিভিশন ক্যামেরা বাগাতে দেখে ঘাবড়ালো না। বরং বোদ্ধা দর্শকের মতো খেলা দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

একটা কিছু করো

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ড্রেস-ডিজাইনার টেড হ্যারিস অনেকদিন ধরে রেফারীর পোশাক পরিবর্তনের জন্যে অন্তহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মতে, রেফারীর জন্যে নির্বাচিত এবং নির্ধারিত অফিসিয়াল ইউনিফর্মটি বড়ো বেশি জোলো এবং মলিন। এই কারণে 'কৃষ্ণবেশী ব্যক্তিটির' অস্তিত্ব মাঠে খুব নগণ্য বলে অনুভূত হয়। ফলে মনস্তাত্ত্বিক কারণে তিনি খেলোয়াড়দের ওপরে প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না।

টেড হ্যারিস পরামর্শ দিচ্ছেন - রেফারীর পোশাক হবে আরো

রঙিন এবং উজ্জ্বল। তাঁর মাথায় অবশ্যই ক্যাপ থাকবে। হ্যারিস বেশ কয়েক ধরনের আকর্ষণীয় ক্যাপের ডিজাইনও করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মহল থেকে কোনোরকম সমর্থন আদায় করতে পারেনি।

অনুকরণীয়

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ফুটবল ফেডারেশনের ঠিকানায় তিন শিলিং ছয় পেন্সের একটা মানি-অর্ডার এলো। উল্টো পিঠে লেখা ছিলো ছোট্ট একটা চিঠি : 'উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-ওয়েল্‌স খেলা শুরু হবার ঠিক আগে স্টেডিয়ামের গেটের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো একটা টিকেট কেনার। ঠিক সেই সময় একপাল দর্শকের ঠেলায় স্টেডিয়ামের একটি গেট ভেঙে গেল এবং জনতার ধাক্কায় আমি একেবারে সোজা এসে পড়লাম স্টেডিয়ামের ভেতরে। ব্যাপারটি ছিলো সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছাকৃত। খেলা দেখার সময় সারাক্ষণ আমি বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়েছি। বিনে পয়সায় খেলা দেখার ব্যাপারটি আমি সহজভাবে নিতে পারিনি। তাই খেলা শেষ হবার পর একটি টিকেটের ক্রয়মূল্য পাঠালাম আপনাদের ঠিকানায়।'

তিষ্ঠ ক্ষণকাল

শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের সাসপেনশনের মেয়াদ বিভিন্ন হতে পারে। তবে ইংল্যাণ্ডের 'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকার মতে—ত্রিনিদাদের ফুটবল ফেডারেশন খেলোয়াড় সাসপেনশনের মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রেফারীকে আক্রমণের অভিযোগে ফ্লয়েড

ডেভিডকে ফেডারেশন সাসপেণ্ড করেছে ৯৯ বছরের জন্যে।

তবে, পত্রিকাটির মতে, ডেভিডের অতোটা হতাশ কিংবা নিরাশ হবার কারণ নেই—আশা আছে কিঞ্চিৎ। ত্রিনিদাদ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী 'শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো খেলোয়াড় তাহার শাস্তি মওকুফের জন্য ফেডারেশনের নিকট বারংবার সনির্বন্ধ মিনতি করিলে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির মেয়াদ অর্ধেক হ্রাস করা যাইতে পারে।'

সে-ক্ষেত্রে ডেভিডকে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ৫০ বছর।

মূল্যবান উপদেশ

ইতালির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রেফারীদের জন্যে শিক্ষামূলক একটি বই বের করেছেন। সেই বই থেকে উদ্ধৃত কিছু উপদেশবাণী:

মাঠে বেশি বড়াই করবেন না। কারণ, আপনি মাঠের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নন। আপনার মতো ক্ষমতাধারী লোক ফুটবল অঙ্গনে রয়েছে হাজার হাজার।

আপনার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অতিরিক্ত কঠোরতা কিংবা অতিরিক্ত কোমলতা প্রকাশ করবেন না। কারণ, এটা ফুটবল মাঠ—নাটকের মঞ্চ নয়।

কোনো খেলোয়াড় আইন ভঙ্গ করলে আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যাবেন না তার দিকে অথবা তার কাঁধ ধরে এমনভাবে ঝাঁকাবেন না যেন আপনি তাকে অ্যারেস্ট করতে চাচ্ছেন। মনে রাখবেন, আপনি রেফারী—পুলিশের লোক না।

দায়িত্বের সুষম বণ্টন

ফুটবলের রাজা পেলে নিউ ইয়র্ক শহরে শিশুদের জন্যে একটি ফুটবল স্কুল খুলেছেন। স্কুলে চারটি ক্লাস। প্রথম শ্রেণীর ক্লাস নেন পেলেজিনিয়ো, দ্বিতীয় শ্রেণীর—দিকো, তৃতীয় শ্রেণীর—এড্‌সন, চতুর্থ শ্রেণীর—পেলে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই চারটি নাম আসলে একজনেরই—ফুটবলের রাজা পেলের, যিনি নিজের ফুটবলজীবনের বিভিন্ন সময়ে এই সবক'টি নামেই পরিচিত হয়েছিলেন।

রেফারী-কাম-অ্যাথলেট

একটি খেলা পরিচালনার সময় একজন রেফারীকে গড়ে কতোটা দৌড়ুতে হয়, কেউ জানেন কি?

সোভিয়েত ইউনিয়নের রেফারী নিকোলাই গাবরিলোভিচ লাতীশেভ হিসেব করে দেখেছেন, নব্বই মিনিটের আক্রমণ এবং পাল্টা-আক্রমণের খেলায় রেফারী দৌড়ে থাকেন গড়ে বারো-তেরো কিলোমিটার অর্থাৎ সাড়ে সাত-আট মাইল।

আইনের ফাঁক

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দু'দলের কোনোটিতে সাতজনের কম খেলোয়াড় মাঠে থাকলে খেলা চলতে পারে না—সেটাই নিয়ম। ভাবতে [illegible] লাগে, প্রথম শ্রেণীর একটি খেলায় একই দলের পাঁচ-পাঁচজন খেলোয়াড় লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে। [illegible] এমনও ঘটে।

আর্জেন্টিনাতে এই ঘটনা ঘটেছে দু'বার। শেষবার এই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো 'এসটে' এবং 'সান লরেন্সো' দলের মধ্যে-কার খেলায়। ঘটনাটি ছিলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত। এই খেলার দিন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা লীগে একশোরও বেশি লাল কার্ড দেখানো হলেও 'এস্‌টে' ছিলো একমাত্র দল, যে-দলের একজন খেলোয়াড়ও মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়নি।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি—খেলার আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ত্যাগ করলো সেই 'এস্‌টে' দলের পঞ্চম খেলোয়াড়। ছয়জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা চলতে পারে না। খেলা বাতিল ঘোষণা করতে হলো। আর্জেন্টিনার ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকেরা খেলার পরে মন্তব্য করেছিলেন যে, পঞ্চম খেলোয়াড় লাল কার্ডটি অর্জন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে।

তাঁদের মতে, বিরতির সময় 'এস্‌টে' দলের খেলোয়াড়েরা আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজয় বরণ করার চেয়ে খেলা ভণ্ডুল করা অনেক শ্রেয় তাদের জন্যে। খেলায় তখন ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিলো 'এস্‌টে'। বিরতির অব্যবহিত পরে তাদের একজন খেলোয়াড় গুরুতর ফাউল করে বসলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। 'এস্‌টের' খেলোয়াড়দের সামনে একই ধরনের একটি দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যে ছিলো—তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 'সান লরেন্সো' দলও একবার এরকম ভূমিকাই নিয়েছিলো 'ওল্ড বয়েজ' দলের সাথে খেলার সময়।

রমণীয় নয়

জনি মোরান্দি, তোতো কুতুনিয়ো এবং ক্রিশ্চিয়ানসহ ইতালির বিখ্যাত পুরুষ পপতারকাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফুটবল দল প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে নামে ইতালির জাতীয় প্রমীলা ফুটবল দলের সাথে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহিলারা পপ-তারকাদের পরাজিত করে ২-১ গোলে।

খেলা শেষে দু'পাশে হাত ঝাঁকিয়ে জনি মোরান্দি বলেন, 'জীবনে কতো দলের সাথেই তো খেললাম, কিন্তু এতো রাফ দলের সাথে খেলিনি আর কখনো।'

পেইন্টার-কাম-স্ট্রাইকার

ট্রেনিং-এর সময় 'সান ক্রিসতোফানো' দলের কোচ দলকে দু'ভাগ করে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু গুনে দেখা গেল, মাঠে আছে সর্বমোট একুশজন খেলোয়াড়। স্টেডিয়ামের চারপাশে তাকালেন কোচ। দেখলেন গ্যালারি পেইন্ট করছে একজন পেইন্টার। খেলতে ডাকা হালো তাকে।

তিন সপ্তাহ পর ব্রাজিল লীগে তাঁর প্রথম গোল করলেন পেইন্টার খোরখে কস্টা।

অন্যরকম দৃষ্টি

স্পেনের ফুটবল লীগে 'হারকুলেস' এবং 'স্পোর্টিং' দলের মধ্যেকার খেলায় রেফারী হাভারতে 'হারকুলেস' দলের দেয়া একটি গোল নাকচ করে দেন। গোলদাতা উঁচু গলায় তর্ক জুড়ে দিলে রেফারী

তাকে সতর্ক করেন হলুদ কার্ড দেখিয়ে। খেলা শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে রেফারী বোধের অতীত এক কারণে সেই খেলোয়াড়টিকেই লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন মাঠ থেকে।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নবানের মুখে রেফারী হাভারতে কৈফিয়ত দেন, 'হলুদ কার্ড দেখানোর পর থেকেই ও বারবার কেমন যেন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে…'

ডানে-বামে সমতা

ইংল্যাণ্ডের 'হিটিং ব্রেডশো' দলের প্রশিক্ষক এরিক লয়েল অদ্ভুত এক পন্থায় ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অধিকাংশ ফুটবলারের দুর্বল স্থান হচ্ছে বাঁ পা। যাতে এই পায়ে তারা কিক করতে শেখে, ট্রেনিং-এর সময় এরিক লোয়েল কেবল তাদের দুর্বল পায়ে বুট পরতে আদেশ দিলেন।

এতে ফল হলো, খেলোয়াড়দের দু'পা-ই চালু হয়ে গেল কিছু-দিনের মধ্যে।

ফ্রান্সের কপাল মন্দ

১৯৮৬-র বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স-ব্রাজিল খেলার সময় ফ্রান্সের স্ট্রাইকার স্তোপিরাকে বিশ্রীভাবে ধাক্কা দিলেন ব্রাজিলের গোলরক্ষক কার্লোস। চার বছর আগের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বাতিস্তনকে পেনাল্টি সীমানার কিনারায় ফাউল করেছিলেন পশ্চিম জার্মানির গোলরক্ষক শুমাখের। দু'-ক্ষেত্রেই ফাউল দু'টো গুরুতর ছিলো, তবু কোনোবারই রেফারী গোলরক্ষক দু'জনকে হলুদ কার্ডও দেখাননি, এমনকি ফ্রান্সকে ফ্রী

কিক বা পেনাল্টির সুযোগও দেননি।

খেলোয়াড়-লেখোয়াড়

সত্তর দশকের পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত গোলরক্ষক সেপ মেয়ার প্রকাশ করতে চাইলেন তাঁর গৌরবময় খেলোয়াড়জীবনের কাহিনী। বই হয়ে বেরুবার আগেই কাহিনীটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে লাগলো একটি পত্রিকা।

সেটা পড়ে ক্ষুব্ধ হলো পাঠকেরা। মিউনিখ শহরের 'বায়ার্ন' ক্লাবের কর্মকর্তারা তো ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন মেয়ারের লেখা পড়ে। কী লিখেছেন তিনি এসব? ব্রাইটনার, রুমেনিগে, বেকেনবাউয়ারসহ তাঁর সতীর্থ বিখ্যাত সব খেলোয়াড়ের নামে যা-তা সব কুৎসা এবং মিথ্যে কাহিনী রটাচ্ছেন তিনি?

লেখক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে শক্ত অভিযোগ দাঁড় করিয়ে আদালতের শরণ নিলেন 'বায়ার্ন' ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সেপ মেয়ারও হাজির সেখানে একই সাথে। কী ব্যাপার? না, মেয়ার নিজেই মামলা ঠুকতে এসেছেন প্রকাশকের বিরুদ্ধে। তিনি জানালেন, 'অনুলেখকের সুবিধের জন্যে ক্যাসেটে আমি নিজের কাহিনী রেকর্ড করেছিলাম। সেটা শুনে প্রকাশক বলেছিলেন যে হুবহু এভাবে লেখা সম্ভব হবে না, কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কয়েকদিন পরে তিনি প্রথম দশ পৃষ্ঠা লিখে এনে দেখালেন আমাকে। পড়ে সেটাতে সই করলাম আমি। পরের লেখাগুলো আমি আর পড়ে দেখিনি। কারণ, প্রকাশক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, বইয়ের বাকি অংশ ও-ভাবেই লেখা হবে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তাঁর কথা। এখন

দেখতে পাচ্ছি, মন-গড়া এমন উদ্ভট কিছু বানোয়াট কাহিনী ছাপা হচ্ছে, যেগুলো কখনও ঘটেনি।'

ফুটবল ঃ ম্যাফিয়া স্টাইল

ঘটনাটি ইতালির ফুটবল লীগের। 'ক্যাজোরিয়া' দলের সাথে রোম থেকে খেলতে এসেছে 'বাংকো দি রোমা' দল।

খেলা শুরু হবার কয়েক মিনিট আগে 'বাংকো দি রোমার' ড্রেসিং-রুমে এসে ঢুকলো মুখোশ-আঁটা তিন ব্যক্তি। ফুটবলারদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে শাসিয়ে গেল তারা, 'আজকের খেলায় জিতলে তোমাদের আর বাড়ি ফিরে যেতে হবে না।' হুমকির গুরুত্বের মাত্রা বোঝাতে তারা ড্রেসিং-রুমের ছাদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো কয়েক রাউণ্ড।

খেলতে নেমে 'বাংকো দি রোমা' দল গা ছেড়ে দিয়ে খেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল 'ক্যাজোরিয়ার' কাছে হেরে গেল। উৎসবে মেতে উঠলো 'ক্যাজোরিয়ার' খেলোয়াড়েরা এবং স্থানীয় দর্শক-বৃন্দ।

আনন্দ করলো 'বাংকো দি রোমার' খেলোয়াড়েরাও—পুরো দল নিয়ে নির্বিঘ্নে রোমে ফিরে যেতে পারছে তারা!

রক্ষক যখন দাতা

গোলরক্ষা যার দায়িত্ব, সে যদি নিজেই নিজের গোলপোস্টে বল ঢুকিয়ে দেয়, সেটা মর্মান্তিক এবং হাস্যকরও বটে। এমন ঘটনা ঘটেছিলো আমাদের বাংলাদেশেই।

এশীয় যুব ফুটবলে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে তুখোড় নৈপুণ্য দেখিয়ে মঈন তখন ভীষণভাবে আলোচিত। ১৯৭৯ সালের ঢাকা ফুটবল লীগে আবাহনীর হয়ে ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে খেলার একসময় বল এলো মঈনের হাতে। গোলকিক নেবার আগে বল নিয়ে একটু কেরিক্যাচার করতে গিয়ে বল তার হাত ফসকে জড়িয়ে গেল আবাহনীর জালে।

বিশ্বের আর কোনো দেশের প্রথম শ্রেণীর খেলায়, সম্ভবত, এ-রকম ঘটনা ঘটেনি।

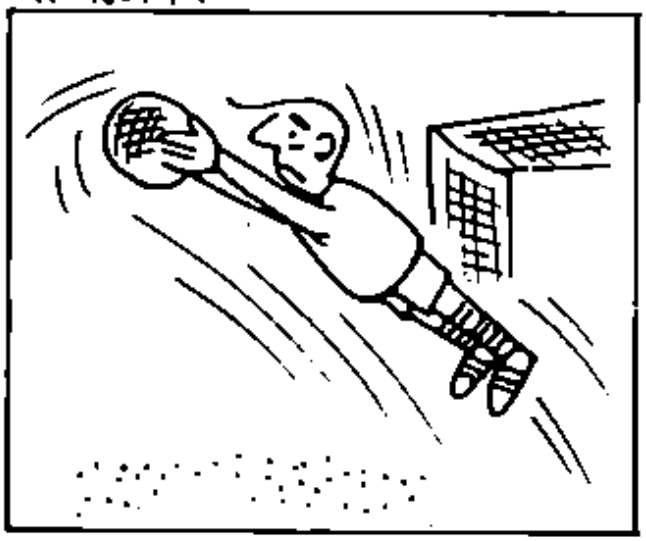

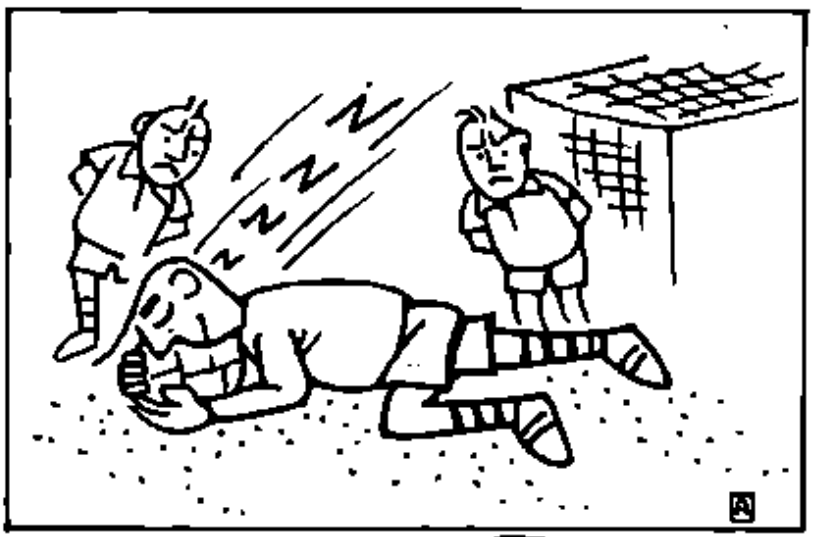

বল-বাগিশ

প্রতিশ্রুতি

কোপেনহেগেনের ক্যামেরা-বিক্রেতা জেন্‌স নিল্‌সন ডেনমার্ক-উরুগুয়ে খেলার আগে ঘোষণা দিলেন, ডেনমার্ক যতো গোলেই জিতুক, তিনি গোলপিছু ১০০ ক্রাউন (১২ ডলার) কম দামে বিক্রি করবেন একেকটি ক্যামেরা।

মেক্সিকো বিশ্বকাপের প্রথম রাউণ্ডের সেই খেলায় ডেনমার্ক-জিতলো ৬-১ গোলে। জেন্‌স নিল্‌সন তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন। সেদিন তাঁর দোকানে ক্যামেরা বিক্রি হলো ৫০০টি। ৯৯৫ ক্রাউন দামের ক্যামেরা তিনি বিক্রি করলেন মাত্র ৩৯৫ ক্রাউনে! প্রতিটি ক্যামেরার পেছনে তাকে গচ্চা দিতে হলো ১৮০ ক্রাউন অর্থাৎ প্রায় ২২ ডলার।

সেদিন তাঁর সর্বমোট লোকসানের পরিমাণ ১০ হাজার ডলা-রেরও বেশি!

অসময়ে হাজিরা

ইংল্যাণ্ডের এক স্টেডিয়ামে এক ফুটবল-উন্মাদকে গ্যালারিতে উশৃঙ্খল আচরণের দায়ে গ্রেফতার করা হয়। বিচারকের সামনে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হলে সে বললো, রেফারীর পক্ষপাতমূলক খেলা পরিচালনার কারণেই সে অশালীন আচরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

আদালত তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলো: আগামী এক বছরে তার প্রিয় ফুটবল দল যতোবার খেলবে, ততোবার তাকে খেলার সময় পুলিশের সামনে এসে ছ'ঘণ্টার হাজিরা দিতে হবে।

ঈশ্বর ব্রাজিলের নাগরিক

কিংবদন্তীর ফুটবলার পেলে একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'ঈশ্বর হলেন একজন ব্রাজিলীয়।' তাঁর এই মন্তব্যের অন্যরকম বিশ্লেষণ করেছেন ফুটবলবোদ্ধারা। তাঁদের মতে, ঈশ্বর একজন ব্রাজিলীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই ঈশ্বর কালো জামা ও কালো হাফ প্যান্ট পরে থাকেন, এবং তিনি বাঁশিও বাজান। ব্রাজিলের দুর্যোগের সময় তিনি ব্রাজিলের পক্ষে নানান সিদ্ধান্ত দিয়ে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অনুকূল হাওয়া

খেলা চলছিলো ব্রাজিলের 'ফ্ল্যামেঙ্গো' আর 'মাতুরেইরা' দলের মধ্যে। খেলা শেষ হবার তখনও দশ মিনিট বাকি। 'ফ্ল্যামেঙ্গো' দলের গোলরক্ষক উবিরামার লম্বা কিকে বল পাঠিয়ে দিলেন মাঠে। সেদিন হাওয়া দিচ্ছিলো খুব। হাওয়ার থপ্পরে পড়ে বল সোজা গিয়ে ঢুকলো প্রতিপক্ষের গোলবারে। 'মাতুরেইরা' দলের গোলরক্ষক রবার্তো সেটা দেখতে পাননি—সে-সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন বুটের ফিতে বাঁধায়।

খেলায় 'ফ্ল্যামেঙ্গো' দল জয়লাভ করে ১-০ গোলে।

সেবা করতে এসে

প্রথম বিশ্বকাপের ঘটনা। আমেরিকা বনাম আর্জেন্টিনার মধ্যে খেলা চলছিলো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সময় পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন আমেরিকার একজন খেলোয়াড়। ওষুধের ব্যাগ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন দলের কোচ। দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন ব্যাগসহ। ব্যাগের ভেতরে ছিলো ক্লোরোফর্মের বোতল। সেটা গেল ভেঙে। ক্লোরোফর্মের গন্ধে জ্ঞান হারালেন কোচ নিজেই।

আহত খেলোয়াড়ের সেবা করতে এসেছিলেন তিনি, অথচ তাঁকেই ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হলো মাঠের বাইরে।

নিখাদ ভালোবাসা

অন্তঃসত্ত্বার খবর ফাঁস হয়ে গেলে মেক্সিকো যাবার ভিসা পাওয়া

যাবে না—এই আশংকা করে কলম্বিয়ার একজন ফুটবলপ্রেমিকা তাঁর গোপন কথাটি গোপনেই রেখেছিলেন। তবে মেক্সিকোয় পৌঁছে যাবার পর তথ্যটি চেপে রাখবার আর কোনো উপায় ছিলো না। স্থানীয় একটি হোটেলকক্ষে তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন।

ভবিষ্যতে মহিলাটি সন্তানসহ মেক্সিকোয় বেড়াতে এসে এই হোটেলে বিনে খরচায় থাকতে পারবেন বলে ঘোষণা দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।

কোচের কারখানা

ফিফা প্রকাশিত এক বুলেটিনে জানা যায়, প্রশিক্ষকের সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থানে রয়েছে যুগোশ্লাভিয়া। নয় হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষকের নাম রেজিস্ট্রি করা আছে যুগোশ্লাভিয়ার ফুটবল ফেডারেশনে। এঁদের সবাই বিশেষ কোর্স শেষ করে পরীক্ষা দিয়ে প্রশিক্ষকের ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার ৬০ জনেরও বেশি কোচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ দেবার কাজে নিয়োজিত আছেন। মেক্সিকো, ক্যামেরুন, গুয়েতেমালা এবং অস্ট্রিয়ার জাতীয় দলের কোচরা হলেন যুগোশ্লাভিয়ার নাগরিক। মেক্সিকোর জাতীয় দলের কোচের সহোদর বড়ো ভাই যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় দলের কোচ। বর্তমানে শুধু কুয়েতেই রয়েছেন ১১ জন যুগোশ্লাভিয়ার কোচ।

এছাড়া লিবিয়া, তিউনিসিয়া, অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া, মরক্কো এবং তুরস্ক ছাড়াও ইউরোপের অনেক দেশেই সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষ-

ণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন যুগোস্লাভিয়ার বেশ কিছু কোচ।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে বোনাস

মেক্সিকোর এক বিয়ার গার্ডেন বিনামূল্যে এক গ্লাস বিয়ার দিয়ে আপ্যায়ন করে তার পরিদর্শকদের। কিন্তু বিশ্বকাপ উপলক্ষে তিন গ্লাস করে বিয়ার বিনামূল্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো বিয়ার গার্ডেন কর্তৃপক্ষ।

সরাসরি যোগাযোগ

সমর্থকদের সাথে দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অস্ট্রিয়ার ক্লাবগুলো। এই লক্ষ্যে তাদের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে যেটি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো—অস্ট্রিয়ার অনেক ক্লাবই নতুন টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করেছে সমর্থকদের জন্যে। সমর্থকেরা যে-কোনো সময় ফোন করে দল গঠন কিংবা ক্রীড়া-কৌশল ইত্যাকার ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব বা মন্তব্য জানাতে পারে।

ক্লাবগুলো জানিয়েছে, আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে সমর্থকদের কাছ থেকে। এক শনিবারেই কেবল 'কল' এসেছিলো ৭০০টি! খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কিছু উপদেশও পাওয়া গেছে এসব 'কল' থেকে।

স্বপ্নবিদারী দুর্ঘটনা

১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ জয় করেছিলো ইতালি। পর-

পরবর্তী বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে জুলে রীমে ট্রফি চিরদিনের জন্যে তাদের সম্পত্তি হয়ে যাবে।

১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে পারলো না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে। ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ হবার কথা ছিলো।

আটঘাট বেঁধে লাগলো ইতালি দল। তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে তারা প্রস্তুত করলো নিজেদের। কিন্তু প্রতিযোগিতার এক বছর আগে ঘটলো একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ইতালির চ্যাম্পিয়ন ক্লাব 'তোরিনো' দলের ফুটবলারেরা লিসবনে এক টুর্নামেন্ট খেলে বিমানে ফিরবার সময় বিমানটি দিক হারিয়ে ফেলে আছড়ে পড়লো টুরিন এক পাহাড়ের গায়ে। সাথে সাথে মারা গেলেন সব খেলোয়াড়ই।

নিহত খেলোয়াড়দের মধ্যে ইতালি জাতীয় দলের অধিনায়কসহ সাতজন খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৪৯ সালের মে মাসে সংঘটিত এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ভেঙে দিলো ইতালির তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।

মুখ নিয়ে মামলা

১৯৭৯ সালের ঘটনা। খেলনা প্রস্তুতকারক এক কোম্পানির বিরুদ্ধে বিখ্যাত ইতালীয় ফুটবলার সানদ্রো মাতসোলার মামলার শুনানী চলছিলো কোর্টে। সানদ্রোর অভিযোগ, কোম্পানিটি এক ধরনের পুতুল ফুটবলার বের করেছে, যেটার মুখাবয়ব তাঁর নিজের।

'আমার মুখ সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজস্ব,' বললেন সানদ্রো

মাতসোলা। 'আমার মুখ ব্যবহার করে তারা মুনাফা লুটবে, এটা হতে পারে না। আমার মুখ ব্যবহারের অনুমতি আমি কাউকে দিইনি, দেবোও না।'

'কিন্তু বিখ্যাত যে-কোনো ব্যক্তিই সমাজের সম্পত্তি, অতএব তাঁর চেহারা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—কথাটা ঠিক নয়,' কোম্পানিপক্ষের উকিল বললেন জোর গলায়।

ইতালীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ঝানু উকিলদের সাহায্য নিয়ে শেষমেষ মামলায় জিতে গেলেন ফুটবলার সানদ্রো মাতসোলা।

যেখানে বাঘের ভয়

ক্যানিংহ্যাম ইংল্যাণ্ডের ফুটবলার, খেলেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। একবার অসুস্থতার কারণে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হলো প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণ থেকে। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ রইলো তাঁর ওপরে, তিনি যেন ঘর ছেড়ে কোথাও বের না হন।

ঘরে বসে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ক্যানিংহ্যাম। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! চুপিসারে পালিয়ে বিখ্যাত এক ডিসকো নাচের অনুষ্ঠানে গেলেন তিনি। ঢুকেই দেখলেন, তাঁর ক্লাবের ম্যানেজার সেখানে বসে। পালিয়ে আর লাভ কী? ম্যানেজার সাহেব ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছেন ক্যানিংহ্যামকে।

১২ হাজার ডলার ফাইন হলো তাঁর এবং তাঁকে সাসপেণ্ড করে রাখা হলো এক মাস।

এক টিকেটে দু'টি খেলা

ইংল্যাণ্ডের একটি ক্লাব একবার ঘোষণা করেছিলো, তাদের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কোনো খেলায় তারা যদি কোনো গোল করতে না পারে, তাহলে সেই খেলার টিকেট দেখিয়েই পরবর্তী খেলা দেখার জন্যে দর্শকরা স্টেডিয়ামে আসতে পারবেন। এবং টিকেটটি বৈধ থাকবে দলটি কোনো গোল না করা পর্যন্ত।

এই ঘোষণার ফলে স্টেডিয়ামে বেড়ে গেল দর্শকদের উপস্থিতি, বাড়লো ভালো খেলার জন্যে স্থানীয় দলের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

রূপকথা

ব্রাজিল দেশে 'বানগু' নামে একটা ফুটবল ক্লাব ছিলো। একদিন হঠাৎ অভাবনীয় একটি উপহার পেলো সেই ক্লাব। উপহারের পরিমাণ ৩৭ কোটি সুইস ফ্রাঁ!

রূপকথাটির রাজকুমার ব্রাজিলের এক অংকের অধ্যাপক এবং বিশাল সম্পত্তির মালিক। তিনি মারা গেলেন ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাঁর মৃত্যুর পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হলো তাঁর সম্পত্তির বিলি-বন্টনের হিসেব-নিকেশ। তাতে উল্লেখ ছিলো, ১৯৬৬ সালের ব্রাজিলের লীগ চ্যাম্পিয়ন 'বানগু' দলের জন্যে তিনি ৩৭ কোটি সুইস ফ্রাঁ রেখে গেছেন। এরকম সিদ্ধান্তের কারণও তিনি উল্লেখ করে গেছেন তাঁর দলিলে।

সে অনেক বছর আগের কথা। বানগু শহরে এক ফুটবল খেলার পরে অনুষ্ঠিত কার্নিভাল উৎসবের সময় অপরূপা এক রাজকন্যের সাথে পরিচয় হয় তাঁর এবং তিনি তাঁকে ভালোবেসে ফেলেন। এটা

ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, উজ্জ্বল এবং স্মরণীয় ঘটনা।

কোটিপতি সেই রাজকুমারের কেউ ছিলো না পৃথিবীতে। তাই মধুর স্মৃতিবিজড়িত শহরের দরিদ্র ফুটবল ক্লাবকে তিনি দান করে গেলেন তাঁর সম্পত্তির একাংশ।

মনে বড়ো আশা ছিলো

মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের কয়েকদিন আগে পেলে ৪৬ বছর বয়সে জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাজিলের একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'সপ্তাহ দুয়েক প্রশিক্ষণ নিলে প্রত্যেক খেলায় অন্তত ৪৫ মিনিট করে আমি খেলতে পারবো, এটা নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস, আমাকে দলে নিলে ব্রাজিল দল উপকৃত হবে।'

ব্রাজিলের প্রশিক্ষক সান্তানার কানে যখন পৌঁছয় কথাটি, তিনি তখন জাতীয় দলসহ মেক্সিকোয় অবস্থান করছেন। তিনি পেলের প্রস্তাবের জন্যে পেলেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, পেলেকে এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই।

হাতীর ফুটবল খেলা

ইন্দোনেশিয়ায় একবার ফুটবলখেলা হয়েছিলো দু'দল হাতীর মধ্যে। খেলায় যে-বলটি ব্যবহার করা হয়েছিলো, তার আকার ছিলো পাঁচ বছরের শিশুর সমান। খেলা চলাকালীন হাতীদের পিঠে বল মাহুতেরা অল্পসল্প সাহায্য করেছিলো শুধু।

অভিনন্দনাহত

খেলার ৭৭ মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। কোনো দলই এখনও গোল করতে পারেনি। খেলায় তুমুল উত্তেজনা। দারুণ জমে উঠেছে খেলা।

১৯৫৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ব্রাজিল খেলছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় দুর্দান্ত শটে ব্রাজিলের ভাভা পরাস্ত করলেন সোভিয়েত গোলরক্ষককে। উল্লসিত ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা অভিনন্দন জানাতে ঘিরে ধরলো গোলদাতা ভাভাকে। কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরলো, কেউ তুলে ধরলো কাঁধে, আবার কেউ চড়ে বসলো ভাভার কাঁধে। খেলায় পরিশ্রান্ত ভাভা অভিনন্দনের আতিশয্যে ভেঙে পড়লেন ক্লান্তিতে। মাঠেই শুয়ে পড়লেন তিনি, উঠে দাঁড়িয়ে খেলার শক্তি আর রইলো না তাঁর। শেষমেষ মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হলো তাঁকে।

নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত

ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রতি স্পেনীয়দের আকর্ষণ ঐতিহ্যগত এবং সর্বজনবিদিত। খোদ স্পেনে একবার ফুটবল খেলা ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিলো ষাঁড়ের কারণে।

কুয়েনতে শহরের স্টেডিয়ামে স্থানীয় একটি দল খেলছিলো অতিথি দল 'গোন্‌শা' ক্লাবের সাথে। খেলার কয়েক মিনিট পার হতেই ফলাফল গিয়ে দাঁড়ালো ২-০ অতিথি দলের অনুকূলে। হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, মাঠে এসে ঢুকলো রাগী, ভয়ংকর এক ষাঁড়, তার পিছু পিছু আরো একটা এবং তার পেছনে আরো একটা।

বুল ফাইটিং-এর দক্ষতা রেফারী বা ফুটবলার কারুরই ছিলো না।

তাই প্রাণ বাঁচাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো সবাই। ওদিকে ষাঁড়-গুলো শিং বাগিয়ে তাড়া করে ফিরছে সবাইকে, ডাকছে আত্মারাম-খাঁচাছাড়া করে দেবার মতো স্বরে, মাঝে-মধ্যে শিং ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাটির ভেতরে।

রেফারী এক ফাঁকে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ড্রেসিংরুমে। খানিকক্ষণ পর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মাঠের দিকে তাকিয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তাঁর—ষাঁড়গুলো তখনও শিং বাগিয়ে সারা মাঠময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে প্রবল দাপটে।

খেলা বাতিল ঘোষণা করতে হলো। পরে জানা গেল, স্থানীয় দলের এক পাঁড় সমর্থকের কীর্তি এটা। অনেক গোলের ব্যবধানে তাঁর প্রিয় দলের পরাজয় হবে আঁচ করতে পেরে তিনি আগেথেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন তিনটি ষাঁড়।

সারমেয় সংবাদ

১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু খেলা শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে বিশ্বকাপ চুরি হয়ে গেল।

কী ভয়ংকর কাণ্ড! বাঘা বাঘা সব গোয়েন্দাকে ডাকা হলো বিশ্ব-কাপ উদ্ধার করতে। আদাজল খেয়ে কাজে লেগে পড়লো তারা। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না সোনার তৈরি বিশ্বকাপ।

কিন্তু সাধারণ একটি কুকুর টেক্কা দিলো সবাইকে। একদিন সকালে হঠাৎ করেই সে বাড়ির পেছনের মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। বিশ্বকাপটি ছিলো ওই মাটির নিচে। খবরের কাগজে জড়ানো অব-স্থায় উদ্ধার করা হলো সেটিকে।

কুকুরটি বিখ্যাত হয়ে গেল রাতারাতি। তার ছবি বেরুলো সব কাগজে। ইংল্যাণ্ডের রাণীর পাশে বসে বিশ্বকাপ খেলা দেখার সুযোগ পেলো সে।

সৌভাগ্যবান এই কুকুরটির নাম ছিলো পিক্‌লস।

পেলের পলায়ন

পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার দৌড়ে পালিয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় চিত্রতারকার কাছ থেকে। সাহায্য প্রার্থনা করে সতীর্থ খেলোয়াড়দের ডাকতে হয়েছিলো পেলেকে, প্রয়োগ করতে হয়েছিলো দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগকে বোকা বানিয়ে অনায়াসে বিপক্ষ সীমায় ঢুকে পড়ার নিপুণ কলাকৌশল। ব্রিজিত বার্দোর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্যারিসের 'কলম্ব' স্টেডিয়ামে। সেদিন 'মার-সেল' আর 'সেন্ট এটেনি' দল দু'টোর খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের বিরুদ্ধে খেলেছিলো ব্রাজিল জাতীয় দল। খেলা শেষে নিজস্ব ফটোগ্রাফারসহ ব্রাজিলের ড্রেসিংরুমে এলেন ব্রিজিত বার্দো। পেলে চুম্বন করছেন ব্রিজিত বার্দোকে—এমন একটি ছবি তাঁরা তুলতে চান। পেলে রাজি না দেখে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন তাঁরা।

'ব্রিজিত বার্দোর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু তাঁর সাথে ওভাবে ছবি তুললে সেটা বোধহয় আমার স্ত্রীর পছন্দ হতো না। সব পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হতো ছবিটি। অমন প্রচারের কোনো দরকার নেই আমার,' পেলে পরে বলে-

ছিলেন। 'তাই পালিয়েছিলাম ওখান থেকে—যদিও পালানো সহজ ছিলো না অতোটা। কিন্তু, হাজার হলেও, আমি তো ফুটবলার।'

সতর্কতা

১৯৩০ সালের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো উরুগুয়েতে। সেমি-ফাইনাল খেলায় উরুগুয়ে যুগোস্লাভিয়াকে ৬-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠলো। অপর সেমিফাইনাল খেলার ফলাফলও হলো ৬-১, আমেরিকাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলো আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপ জেতার জন্যে দু'দেশই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দু'দেশই আবার একে অপরের প্রতিবেশী। সমর্থকদের ভেতরে তাই জোর উত্তেজনা।

ফাইনাল খেলার আগের দিন থেকেই আর্জেন্টিনার হাজার হাজার সমর্থক জাহাজ-স্টীমার-নৌকায় চেপে প্লেট নদী পার হয়ে আসতে লাগলো উরুগুয়েতে। সতর্ক হয়ে উঠলো উরুগুয়ের পুলিশ বাহিনী। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা প্রচুর। অতএব জাহাজ-স্টীমার-নৌকোর সব যাত্রীকে তল্লাশি করা হলো, যাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্রসহ মাঠে ঢুকতে না পারে কেউ।

খেলা চললো নির্বিঘ্নে। আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হলো উরুগুয়ে।

বক্সার

রোমানেইরু—পর্তুগালের একজন ফুটবলভক্ত। একদিন সে তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগের একটি খেলা দেখছিলো এবং প্রায়ই ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করছিলো রেফারীর নেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে।

একসময় নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'শালা জোচ্চোর রেফারী।' ঘটনাটির শেষ এখানেই নয়। এক লাফে সে ঢুকে পড়লো মাঠের ভেতরে তারপর এক ঘুষিতে রেফারীকে নকডাউন!

ঘটনা গড়ালো আদালত পর্যন্ত। মোটা অঙ্কের ফাইন হলো তার এবং পরবর্তী দু'বছরের জন্যে পুর্তুগালের সবস্টেডিয়ামে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো তার জন্যে।

নিজেকে জানো

সুইডেনের 'ফালচেপিঙ্গ কামরাতেরনা' ক্লাবের কর্মকর্তারা ফুটবলার-দের খেলার মান উন্নত করার জন্যে উদ্ভাবন করেছিলেন একটি অভিনব পদ্ধতি। ক্লাব এবং ফুটবলারদের সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব লেখা ছাপা হতো, সেগুলো কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হতো খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে। সমালোচনার সবচেয়ে ধারালো বা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখা হতো কিংবা 'বক্স' তৈরি করে দেয়া হতো রঙিন কালি দিয়ে।

'আশাতীত ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে এতে,' বলেছিলেন ক্লাবটির সভাপতি। 'প্রথম প্রথম খুব খেপে গিয়েছিলো ফুটবলা-রেরা। পরে নিজেরাই বুঝতে পেরেছে, সমালোচনাগুলো নেহাত অযৌক্তিক বা মিথ্যে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরা সত্যি কথাটাই লিখেছে। নিজেদের ভুল শুধরে নেবার জন্যে আর পিছপা হয়নি খেলোয়াড়েরা। এখন সবাই মনোযোগ সহকারে অংশ নেয় ট্রেনিং-এ, চেষ্টা করে অতীতে করা ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না

করতে।'

মাথা রে।

১৯৮০ সালের ঘটনা। রুমানিয়ার টিমিশোয়ার শহরে 'পলিটেকনিকা' এবং ব্রাজিলের 'আত্‌লেতিকো' দলের মধ্যে খেলা চলছে।

একসময় ব্রাজিলের একজন স্ট্রাইকার প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দুর্ধর্ষ গতিতে ঢুকে পড়লো বিপক্ষ দলের পেনাল্টি সীমানায়। প্রতিপক্ষীয় রক্ষণভাগের সব খেলোয়াড় পড়ে আছে তার পেছনে। সে তখন গোলকীপারের মুখোমুখি। 'পলিটেকনিকা' দলের দুঃসাহসী গোলকীপার ঝাঁপিয়ে পড়লো আগুয়ান স্ট্রাইকারের পায়ে। পাশ কাটিয়ে বেরুতে গিয়ে স্ট্রাইকারের মাথা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো গোলবারকে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু গোলবার ভেঙে দু'টুকরো! স্টেডিয়ামের কর্মচারীদের তৎপরতায় খেলা শুরু হলো কুড়ি মিনিট পরে।

আর ব্রাজিলের সেই স্ট্রাইকার, যেন কোনোকিছুই হয়নি, খেলা চালিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

মন তার উড়ু উড়ু চঞ্চল

পেদ্‌রো ভালদেস আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়। খেলোয়াড় হিসেবে তেমন বিখ্যাত না হলেও উচাটন স্বভাবের কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। কোনো ক্লাবেই তিনি এক মৌসুমের বেশি খেলেননি।

কুড়ি বছরের ফুটবল জীবনে তিনি ক্লাব বদল করেছেন কুড়ি বার।

অলঙ্কার কেলেঙ্কারী

১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ডের ববি মুর খেলায় অংশগ্রহণ করেন জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে। কারণ, বিশ্বকাপ শুরু হবার আগে মেক্সিকোর পুলিশ হীরে চুরির অভিযোগে ববি মুরকে জেলে পুরে রাখে।

ঘটনাটা ছিলো এরকম। মেক্সিকোর এক অলঙ্কারের দোকানে ববি মুর এবং ববি চার্লটন ঢুকেছিলেন কেনাকাটা করতে। যে-মুহূর্তে তাঁরা দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে হীরের নেকলেস চুরি গেছে বলে চিৎকার করতে শুরু করে একজন মহিলা। পুলিশ এসে হাজির হলো ঘটনাস্থলে। অনেক জেরার পর পুলিশ ববি মুরকে গ্রেফতার করে হাজতে পুরলো।

পরদিন সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হলো যে, চুরি করার দায়ে ববি মুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবু জামিনে ছাড়া পেয়ে ইংল্যাণ্ডের হয়ে খেললেন তিনি।

এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পারলো না কেউ। মাঝখান থেকে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কলঙ্ক রটলো ইংল্যাণ্ডের সাড়া জাগানো ফুটবলার ববি মুরের নামে।

দৈব সাফল্য

ইতালিতে অনুষ্ঠিত ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা চলছিলো ইতালি আর চেকোশ্লাভাকিয়ার মধ্যে। দুর্দান্ত এক বাঁক খাওয়া শটে গোল করে বসলেন ইতালির উইঙ্গার ওরসি। গোলটি দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করলেন যে, গোলটি দৈবাৎ হয়ে গেছে।

কারণ, সাধারণ অবস্থায় অমন গোল করা অসম্ভব ব্যাপার।

কথাটি ওরসির কানে যেতেই চটে উঠলেন তিনি। বললেন, ও-রকম শট তিনি যতোবার ইচ্ছে করতে পারেন। পরদিন সকালে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের উপস্থিতিতে দেখাতে চাইলেন সেই শটের নমুনা।

গোটা বিশেক শট নিলেন তিনি। কিন্তু বল একবারও ঢোকাতে পারলেন না ফাঁকা গোলপোস্টে।

ও মোর ময়না গো

ব্রাজিলের রেফারী এউজেনিও দা সিলভা। খেলা পরিচালনা করতে মাঠে এলে তিনি সাথে নিয়ে আসেন তাঁর প্রিয় ময়না পাখিটিকে। পাখিটি কথা বলে চমৎকার।

ময়নাটি ছিলো রেফারীর তালিসমান বা মন্ত্রপূত কবচের মতো। তার উপস্থিতিতে তিনি খেলা পরিচালনা করেন খুব দৃঢ় হাতে, আস্থার সাথে এবং নির্ভুলভাবে।

ফুটবল-মাঠে তো কতো রকমের শব্দই হয়। অথচ এতোসব শব্দের মধ্যে ময়নার পছন্দ হলো রেফারীর বাঁশির শব্দ। খুব দ্রুত শিখে ফেললো সে শব্দটি। এরপর থেকে মাঠে এলেই সে তীক্ষ্ণস্বরে রেফারীর বাঁশির অনুকরণ করে যখন-তখন। খেলায় তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। ভুল করতে লাগলো খেলোয়াড়েরা, রেফারী স্বয়ং। দর্শকদেরও মাথা খারাপ হবার যোগাড়। কোনটা আসল বাঁশির স্বর, কোনটা নকল—কে জানে!

তবু সবাই সহ্য করে চললো ব্যাপারটি। একদিন গুরুত্বপূর্ণ একটি

ম্যাচ পণ্ড হয়ে গেল ময়নার এরকম অযাচিত আচরণের ফলে। এর পরে ময়নাকে সাথে নিয়ে মাঠে আসা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো রেফারী এউজেনিও দা সিলভাকে।

ফুটবলের ফাঁসি

ব্রাজিল হেরে গেল ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে। সমর্থকরা ক্ষুব্ধ, মনোক্ষুণ্ণ, হতাশ। রিও ডি জেনিরোর একদল উগ্র সমর্থক অতি উন্মাদনার বশে একটি রাস্তায় একটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করলো ব্রাজিল দলের ম্যানেজার ভিসেনটি ফিউলার জন্যে।

জয়ের আনন্দে ?

প্রিয় দলের পরাজয়ে আত্মহত্যার নমুনা আছে। কিন্তু বিজয়ের পরেও কি ঘটে থাকে এরকম ঘটনা ?

ব্রাজিলের এক স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন একজন যাত্রী। সেই সময় তিনি শুনলেন ব্রাজিল গোল করেছে পেরুর বিরুদ্ধে। আনন্দের আতিশয্যে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

সেদিনেরই ঘটনা। রিও ডি জেনিরোর পথে বাস চালাবার সময় একজন বাসচালক শুনলেন, পেরুকে হারিয়েছে ব্রাজিল। প্রবল আনন্দ সহ্য করতে না পেরে তিনি ছেড়ে দেন বাসের স্টিয়ারিং এবং দরজা খুলে চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাস্তায়। সেদিন অবশ্য তিনি মারা যাননি, মারা গিয়েছিলো একজন নিরীহ পথচারী। চলন্ত বাস আঘাত করেছিলো তাকে।

সেদিনই ব্রাজিলের বিজয়ের পর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলো আরো দু'জন ব্রাজিলের সমর্থক।

সোফিয়া লরেনও ফেল

১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের পর ইতালির ফুটবলার লুইগি রিভা অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন দেশে এবং বিদেশে। জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্যে ইতালিতে 'ম্যান অভ দ্য ইয়ার'-এর জন্য গৃহীত মতামত যাচাই করে দেখা যায় যে, ইতালির প্রেসিডেন্ট এবং সোফিয়া লরেন এর চেয়েও বেশি জনপ্রিয় লুইগি রিভা।

উঠোন বাঁকা হলেও

ফ্রানসিসকো দস সান্তোস—বললে কেউই চিনবে না। কিন্তু যদি বলা হয়—গারিনচা? তাঁকে সবাই চেনে এক নামে। গারিনচা অর্থ ছোট পাখি। ফুটবলের মাঠে অনায়াস বিচরণই বোধহয় এই নাম জোটাতে সাহায্য করেছিলো তাঁকে।

ধনুকের মতো বাঁকা ছিলো তাঁর পা দু'টো। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন ছেলেবেলায়। ফুটবলের প্রতি তাঁর অপরিসীম উৎসাহ দেখে অনেকেই করুণা করতো তাঁকে। কারণ অমন পা নিয়ে আর যাই হোক ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। তাঁর বাঁকা পায়ের জন্যে অনেকেই তাঁকে বিকলাঙ্গ বলে মনে করতো।

কিন্তু ফুটবলের বরপুত্র গারিনচা ছিলেন অসাধারণ কুশলী এক খেলোয়াড়। খোদ ব্রাজিলে জনপ্রিয়তার বিচারে পেলের পরেই তাঁর স্থান।

শ্বেত সন্ত্রাস

খেলার মাঠে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে বৃটেনের ফুটবল-স্টেডিয়াম-গুলো থেকে শুধু গত বছরই গ্রেফতার করা হয়েছে ৬১৪০ জনকে! খেলা চলার সময় আপত্তিকর কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে স্টেডিয়াম থেকে ৬৫৪২ জনকে বের করে দেয়া হয়।

খবরটি পাওয়া গেছে পুলিশসূত্র থেকে।

ওয়েস্টার্ন

১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা আর হল্যাণ্ড। আর্জেন্টিনার নাগরিক আলফ্রেড পারসিয়া সে-সময়ে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে। আর্জেন্টিনার নিবেদিত-প্রাণ সমর্থক তিনি। টিভিতে সম্প্রচারিত খেলা দেখার সময় ভীষণ টেনশনে ভুগছিলেন এবং আর্জেন্টিনা প্রত্যেকবার গোল করার পর আনন্দ প্রকাশ করছিলেন রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ে।

গুলির শব্দে ভীত-সন্ত্রস্ত প্রতিবেশীরা পুলিশ ডেকে আনে। পরে ব্যাপারটি গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

মহাশূন্যে ফুটবল

এটাও ১৯৭৮ সালের ঘটনা। বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে তখন। ওদিকে মহাশূন্যযানে ভ্রমণ করছেন দুই রুশ নভোচারী পাভেল পপোভিচ এবং ইউরি আরতিউখিন। মহাশূন্যে বিচরণ করলে কী হবে, তাঁদের মন পড়ে আছে পৃথিবীতে, বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঠ। তাঁদের মহাশূন্যযানটি যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিলো, তখন অনুষ্ঠানরত

ব্রাজিল-পোল্যাণ্ড খেলাটি তাঁরা টেলিভিশনে উপভোগ করলেন সেখানে বসেই।

'ওয়ার্ল্ড গেম' হিসেবে পরিচিত ফুটবল পৃথিবীর বাইরে বসে দেখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এই দুই রুশ নভোচারী।

নাৎসী বনাম মাফিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কথা। নাৎসী-জার্মানির সাথে ফ্যাসিস্ট ইতালীর মধ্যে তখন চূড়ান্ত দহরম-মহরম। সেই সময় ইতালিতে রাখা ছিলো ১৯৩৮ সালে তাদের জয় করা বিশ্বকাপ ট্রফিটি। চক-চকে উজ্জ্বল সোনার তৈরি এই ট্রফির দিকে নজর পড়লো হিটলারের কয়েকজন অনুসারীর। তারা ট্রফিটি হাতিয়েনেবার ষড়যন্ত্র করলো।

কিন্তু ফাঁস হয়ে গেল তাদের কুমতলব। সতর্ক হয়ে উঠলো ইতা-লীয়রা। জার্মান সেনানায়কদের অজ্ঞাতে তারা গোপনে ট্রফিটিকে পুঁতে ফেললো সাত হাত মাটির নিচে। যুদ্ধ শেষ হবার পর মাটি খুঁড়ে সেটাকে তুলে এনে ইতালীয়রা জমা দেয় আন্তর্জাতিক ফুট-বল ফেডারেশনকে।

বল ধরা মাছ ধরা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কিংবদন্তীর গোলরক্ষক লেভ ইয়াশিনের অন্যতম নেশা মাছ ধরা। বিভিন্ন দেশে খেলতে গিয়ে সময় পেলেই তিনি ছিপ হাতে নিয়ে বসেছেন পুকুর কিংবা নদীর পাড়ে। এক-বার পূর্ব জার্মানি ভ্রমণের সময় সে-দেশের নারী দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিতদের উপহার দেন তাঁর ধরা একটি বিরাট মাছ।

সেদিন থেকেই সবাই জেনে যায়, শুধু বল ধরায় নয়, মাছ ধরাতেও তিনি সমান দক্ষ।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে নামী দল ইতালি হেরে গেল পোল্যাণ্ডের কাছে। ইতালির সমর্থকরা সহজে নিতে পারলো না ব্যাপারটিকে। তারা দল বেঁধে এগিয়ে গেল ইতালীতে অবস্থিত পোলিশ রাষ্ট্রদূত ভবনের দিকে। তাদের হামলা ঠেকাতে সেদিন হিমশিম খেতে হয়েছিলো পুলিশকে।

রোমের অধিবাসী এক তরুণ ইতালির পরাজয়ে এতো বেশি আঘাত পায় যে, সে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে তার হাতের শিরা। এই অপমান সহ্য করার চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয় বলে মনে হয়েছিলো তার। কিন্তু সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায় সে।

ডান পায়ের ব্যবহার

হাঙ্গেরির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার পুসকাস প্রশিক্ষণের ধার ধারতেন না কখনও। ব্যাপারটি বাহুল্য মনে হতো তাঁর কাছে। কারণ, তিনি ছিলেন জন্মগত ফুটবলার। সহজাত প্রতিভাবলে চোখধাঁধানো ড্রিবলিং করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যা কিছু করতেন, সব বাঁ পায়ে। এক-পেয়ে খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন ঠিক তাই। কিন্তু তাঁর ওই এক পায়ের ভেলকি দেখেই পৃথিবী মোহিত।

তাঁর এই সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তিনি

নিজেও। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'যাতে ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, আমার ডান পা-টি আছে সে-জন্যেই।'

ফুটবলে ডোপিং

১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের সময় স্কটল্যাণ্ডের খেলোয়াড় উইলি জনস্টনকে আগেভাগেই আর্জেন্টিনা থেকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ, একটি খেলায় উত্তেজক ওষুধ খেয়ে নেমেছিলেন জনস্টন। ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যেতেই স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নির্দ্বিধায় কঠোর শাস্তি আরোপ করে তাঁর ওপরে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয় তাঁর কাছ থেকে।

দেশে ফেরার সময় অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন জনস্টন।

না-খোলা শ্যাম্পেন

বিশ্বকাপের আসর বসেছে ব্রাজিলে। ফাইনালেও উঠেছে ব্রাজিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দল—উরুগুয়ে। খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে এসেছে দু'-লক্ষেরও বেশি লোক। 'ব্রাজিল ব্রাজিল' চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

কিন্তু খেলায় জিতে গেল উরুগুয়ে। প্রথমে গোল করেও ব্রাজিল জিততে পারলো না। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেল তিন-জন ব্রাজিলের সমর্থক। আরেকজন রিভলভারের গুলিতে উড়িয়ে দিলো নিজের মাথার খুলি। স্টেডিয়ামের ৬৯ জন দর্শক সেদিন জ্ঞান হারিয়েছিলো শোকে।

ব্রাজিলের জয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে আগে থেকেই স্টেডিয়ামে নিয়ে

আসা হয়েছিলো ২০ হাজার বোতল শ্যাম্পেন ! খেলা শেষে সব বোতল পড়ে রইলো না-ছোঁয়া অবস্থায়।

বড়পাণ্ডব

১৯৬৫ সালে রুমানিয়ায় ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো বুখারেস্টের 'ডিনামো' দল। সে-বছর 'নুনভাইলের' পরিবারের ৬ জন সহোদর ভাই খেলতো সেই দলে। পৃথিবীর আর কোথাও প্রথম বিভাগের কোনো ফুটবল দলে এতোজন সহোদর ভাইয়ের একসঙ্গে খেলার কথা শোনা যায়নি।

ভাষার খিচুড়ি

গ্রীসের 'আপোলোন' ফুটবল দলে খেলে দু'জন উরুগুয়ের খেলোয়াড়। তা সত্ত্বেও লীগে ভীষণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো দলটি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রশিক্ষক পেত্‌রোপোলুসকে বদলাতে হবে এবং ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে উরুগুয়ের দু'জনকেও।

পেত্‌রোপোলুস আত্মপক্ষ সমর্থক করে জানালেন যে, বিশেষ করে উরুগুয়ের ফুটবলার দু'জনের সাথে তাঁর বনিবনা হচ্ছিলো না এবং অতি স্বাভাবিক কারণেই সেটা প্রভাব ফেলেছে দলের পারফরমেন্সের ওপরে।

ওদিকে ফালেরো এবং ফারনান্দেস নামের উরুগুয়ের খেলোয়াড় দুজন জানালো, তাদের খেলার মান আশানুরূপ না হবার প্রধান কারণ হলো—তারা দু'জন গ্রীক ভাষা জানে না এবং কোচ জানেন না স্প্যানিশ।

যুগোস্লাভিয়া থেকে নতুন কোচ আমদানী করা হলো। নাম—ভেসেলিনোভিচ। তিনি গ্রীকও জানেন না, স্প্যানিশও জানেন না। নতুন প্রশিক্ষকের অধীনে অনেক ভালো খেলার প্রতিশ্রুতি দিলেও উরুগুয়ের দু'জনকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন 'আপোলোন' দলের কর্মকর্তারা।

ফুটবলপ্রাণ

ডেরেক ডেলটন ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী। 'রোটারহাম' দলের সমর্থক। ছোটবেলায় দু'বছর বয়সে ভুগেছিলেন পোলিও রোগে। এখন প্রায় বিকলাঙ্গের জীবন যাপন করেন। চলাফেরার জন্যে তাঁর আছে একটি বিশেষ ধরনের গাড়ি। সেটাতে চড়ে তিনি শুধু স্টেডিয়ামে যান নিয়মিত তাঁর প্রিয় দলের খেলা দেখতে। 'রোটারহাম' দলের কোনো খেলাই মিস করেন না তিনি। শুধু স্টেডিয়ামে যাতায়াতের জন্যে তিনি ভ্রমণ করেছেন ৫ হাজার মাইলেরও বেশি!

গোলরক্ষকের হ্যাট্রিক

একটি ম্যাচে একটি দলের বিরুদ্ধে তিনটি পেনাল্টি হওয়া এমনিতেই খুব বিরল ব্যাপার, কিন্তু তারচেয়ে বিরল ব্যাপার হয় তখন, যখন তিনটি পেনাল্টিই রুখে দেয় গোলরক্ষক। ১৯২৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রোস্তভ ডিনামো' ক্লাবের গোলরক্ষক এই অসাধ্যটি সাধন করেছিলেন। এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ইভান রীজভ মস্কো বনাম কিয়েভ দলের খেলায়।

বড়ো দেরি হয়ে যায়

বিরতির সময় একজন সমর্থকের সাথে গল্পে মত্ত হয়ে পড়লো গোল-রক্ষক। হঠাৎ রেফারীর বাঁশি শুনে তার খেয়াল হলো—খেলা শুরু হয়ে গেছে। দৌড়ে গোলবারের সামনে এসে যখন দাঁড়ালো সে, অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। সে শুধু অসহায়ের মতো দেখলো, দূর থেকে কিক করে পাঠানো বলটি কীভাবে জড়িয়ে গেল জালে। স্থানীয় সাংবাদিকেরা এই গোলটিকে 'বছরের সবচেয়ে ফালতু গোল' আখ্যা দিয়েছিলো।

ঘটনাটি ঘটেছিলো অস্ট্রিয়ায়।

ফুটবলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

১৯৮৭ সালের ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সম্পূর্ণ দর্শকবিহীন এক সামরিক স্টেডিয়ামে। দর্শকবিহীন ফুটবল মানে তো ফুটবলের পরলোকগমন। সেটা উপলব্ধি করে স্থানীয় এক সপ্তাহিক পত্রিকা অত্যন্ত জুতসই একটি মন্তব্য করেছিলো—'সামরিক মর্যাদায় ফুটবলের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।'

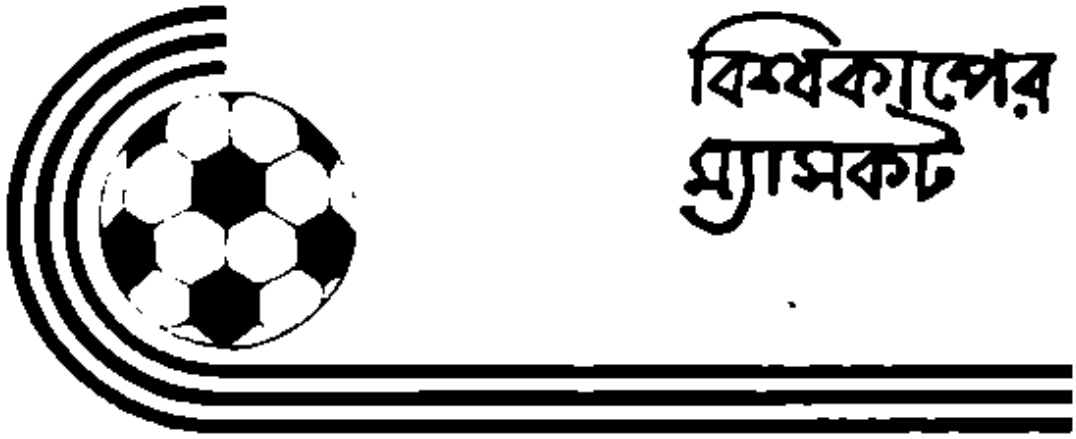

বিশ্বকাপের ম্যাসকট

বিশ্বকাপের ম্যাসকট

বিশ্বকাপের মতো একটি টুর্নামেন্ট, অথচ সেটার কোনো প্রতীক থাকবে না, তা কী করে হয়? এই কথাটি প্রথম মাথায় আসে ইংল্যাণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবার আগে তারা সেই বিশ্বকাপের প্রতীক নির্ধারণ করে--বৃটেনের ঐতিহ্যবাহী সিংহের ছবি। তাকে আদর করে 'উইলি' বলে ডাকা হতো। খুব ছোটখাটো সে, দেখতে মোটেও

ভয়ংকর নয়, পরনে ফুটবলারের জার্সি। জার্সির ওপরে আবার বৃটেনের পতাকা, তার মাঝখানে লেখা—'ওয়ার্ল্ড কাপ'।

উইলি নামের সিংহটি খুব জনপ্রিয়তা পেলো দেশে এবং বিদেশে। ফলে পরবর্তী বিশ্বকাপের স্বাগতিক দেশ মেক্সিকো বাধ্য হলো তার উত্তরসূরি নির্বাচন করতে। অনেক বিখ্যাত শিল্পীর প্রস্তাবিত প্রতীক থেকে বেছে নেয়া হলো ওপরেরটি। একজন ফুটবলার সে। নাম গুয়ানিতো। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও সে ভালোভাবেই জানে নিজের মূল্য (অবশ্যই একজন ফুটবলার হিসেবে)।

পরবর্তী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হলো ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানিতে।

সেই বিশ্বকাপের প্রতীক ছিলো 'টিপ এবং ট্যাপ'। শিল্পী গুস্ট শাফের-এর আঁকা এই প্রতীকটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো সেই সময়ে।

১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের স্বাগতিক দেশ আর্জেন্টিনাও হাত গুটিয়ে বসে রইলো না। বিশ্বকাপ শুরু হবার আগেই নির্বাচিত প্রতীকের সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দিলো। এটা একজন আর্জেন্টিনীয় কৃষকের ছবি। আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরব ছিলো কৃষকরা। প্রতীকটি দেখে ফিফার একজন কর্মকর্তা প্রশ্ন করেছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবল-কর্মকর্তাকে, 'আপনাদের এই লোকটি এতো সিরিয়াস ভঙ্গির কেন?'

কৌশল করে হয়তো জুতসই একটি উত্তর দেয়া যেতো, যেমন —আর্জেন্টিনার বিখ্যাত 'ট্যাঙ্গো'-ও তো বেশ সিরিয়াস ধরনের নাচ আসলেও তাই। বিশ্বকাপের প্রতীক সিরিয়াস বা একটু কঠোর চেহারার হলে আপত্তিটা কোথায়? এই প্রতীকটি কি যথেষ্ট সুদর্শন, লক্ষ্যভেদী এবং পুরোপুরি আধুনিক নয়?

বিশ্বকাপের প্রতীক নির্ধারণ করা একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে। অতএব ১৯৮২ সালে ব্যস্ত হয়ে পড়লো স্পেনের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। কারণ, বিশ্বকাপ সে-বছরে অনুষ্ঠিত হবে স্পেনে। অসংখ্য প্রস্তাব এলো। কিন্তু পছন্দসই প্রতীক নির্বাচিত করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন বিচারকেরা। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না পুরোপুরি।

হঠাৎ একদিন সাধারণ একজন লোক এসে ঢুকলো ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে। নাম—খোসে মারিয়া মার্টিন, তার হাতে একটি কমলা। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো সে, 'এই যে আমার হাতে একটি কমলা দেখছেন, ভালো করে দেখুন, কী হাসিখুশি এটি এবং একেবারে সূর্যের মতো রঙ! এটাকে কি আপনারা প্রতীক বানাতে পারেন না?'

মহিলা-শিল্পী মারিয়া দোলোরেস সালতো ঝটপট ছবি এঁকে ফেললেন সেই আইডিয়া থেকে। দেখে হৈহৈ করে বলে উঠলো সবাই, 'এটাই তো চাচ্ছিলাম আমরা!'

মাথায় পশমের তৈরি একটি হ্যাট, খুব স্মার্ট, চেহারাটি ভীষণ মজাদার। নাম তার—পিকে। ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের প্রতীক ছিলো এটি। পিকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো ভীষণ তাড়াতাড়ি। করারই কথা। এমন চেহারার কাউকে ভালো না বেসে পারা যায়?

পিকের কিন্তু অনেক গুণ। তার মধ্যে একটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো ওর ঔৎসুক্য এবং কৌতূহল। ফুটবল-জগতে কী ঘটছে, সে-ব্যাপারে ও সব জানে (কিংবা প্রায় সব)।